From The Author of "My Life With Taliban"

অ্যাম্বাসেডর

AMBASSADOR

আবদুস সালাম জাইফ

আবদুস সালাম জাইফ

১৯৬৭ সালের পয়লা জানুয়ারি আফগানিস্তানের কান্দাহারে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থায় আফগান-সোভিয়েত যুদ্ধে অংশগ্রহন করেন। ১৬ বছর বয়সে সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই—এর কাছে। যুদ্ধ শেষে কান্দাহারে নিজ বাড়ি ফিরে আসেন। কিন্তু গৃহযুদ্ধ এবং ভয়াবহ ভূমিকম্পের ফলে ১৯৯১ সালে তিনি আবারও পাকিস্তান চলে যেতে বাধ্য হন। ১৯৯২ সালে কান্দাহারের এক মসজিদে ইমামের দায়িত্ব নিয়ে আবারও ফিরে আসেন। রাশিয়ানদের বিদায়ের পর গৃহযুদ্ধ শুরু হলে বিভিন্ন বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন। যার ফলে তালিবান সৃষ্টি হয়। আবদুস সালাম জাইফ তালিবানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।

তালিবান কান্দাহার দখল করে নিলে আব্দুস সালাম জাইফ বিচার বিভাগে কাজ করেন। বয়স যখন সাতাশ তখন তাঁকে হেরাতের ব্যাঙ্কসমূহের দায়িত্ব দেওয়া হয়, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই মোল্লা মোহাম্মদ ওমর তাঁকে কাবুলের প্রতিরক্ষা বিভাগের প্রশাসনিক পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত করলে তিনি সেই দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৯৭ থেকে ১৯৯৯-এর মধ্যে খনিজ ও শিল্প মন্ত্রণালয় এবং যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৯ সালে তালিবান সরকার কর্তৃক পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিযুক্ত হন। ২০০১ সালে রাষ্ট্রদূত থাকাবস্থায় গ্রেফতার করে গুয়ান্তানামো বে কারাগারে পাঠানো হয় আব্দুস সালাম জাইফকে।

২০২০ সালে ২৯ই ফেব্রুয়ারি তালিবান- আমেরিকা শান্তিচুক্তিতে তালিবান প্রতিনিধি দলের সদস্য ছিলেন আব্দুস সালাম জাইফ।

আবদুস সালাম জাইফ

অ্যাম্বাসেডর

ভাষান্তর : আব্দুল্লাহ মাহমুদ

৪৫ বাংলাবাজার, কম্পিউটার কমপ্লেক্স, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৫৭২ ৪১০ ০১৮
facebook.com/projonmopublication
www.projonmo.pub

আবদুস সালাম জাইফ

অ্যাম্বাসেডর

প্রকাশকাল : জুন ২০২০

প্রচ্ছদ : ওয়াহিদ তুষার

পরিবেশক

আমাদেরবই ডট কম
২য় তলা, ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ০১৯৫৪ ০১৪ ৭২০

অনলাইন পরিবেশক

www.amaderboi.com
www.rokomari.com
www.boibazar.com
www.niyamahshop.com
www.ruhamashop.com
www.wafilife.com

E-book edition

মুহিবই সেইবই এইটই

প্রজন্ম পাবলিকেশনের পক্ষে আহমদ মুসা ও ওয়াহিদ তুষার কর্তৃক ৪৫ বাংলাবাজার, কম্পিউটার কমপ্লেক্স, ঢাকা-১১০০ থেকে প্রকাশিত; মার্জিন সলিউশন, ৩৪ বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

Ambassador by Abdus Salam Zaeef, Translated by Abdullah Mahmud,
Published by Projonmo Publication

ISBN : 978-984-94393-5-6

সূচীপত্র

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পাকিস্তানে নিযুক্ত তালিবান শাসিত আফগানিস্তানের সাবেক রাষ্ট্রদূতের মুখোমুখি বসার কথা আমি কল্পনায়ও ভাবিনি। দখলদার আমেরিকার সাথে গলা মিলিয়ে মেইনস্ট্রিম মিডিয়া এতদিন আফগান মুজাহিদদের সম্পর্কে এক বীভৎস ছবি এঁকে দিয়েছে আমাদের সামনে। আমরা এখন বিশ্বাস করি তালিবান হলো নারীবিদ্বেষী আর লুটেরা এক সন্ত্রাসী দল। শেখ আবদুস সালামের সাথে সেই সাক্ষাৎকারটি ছিল আমার সমগ্র চেতনা জুড়ে লেপ্টে থাকা সেসব মিথ্যে ছবির সম্পূর্ণ বিপরীত এক অভিজ্ঞতা। আমার সামনে সেদিন বসে ছিলেন প্রখর ধীশক্তিসম্পন্ন, স্পষ্ট রসবোধযুক্ত এবং তীব্র মেধাবী একজন মহৎ ব্যক্তি। তাঁকে দেখে একবারও মনে হয়নি যে, একজন নারীর সাথে কথা বলতে তিনি খুব বেশি কুণ্ঠাবোধ করছেন। তাঁর কর্মজীবন এবং কারাজীবন নিয়ে আমাদের সেদিনকার আলাপ মাঝেমধ্যেই খুব গভীর অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ আলোচনায় মোড় নিচ্ছিল। তাঁর প্রতি কী এক শ্রদ্ধাবোধের কারণে যেন আমি গুয়ান্তানামো বে কারাগারের শারীরিক নির্যাতনের ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন করা থেকে বারবার নিজেকে নিবৃত্ত করছিলাম। অবশ্য তাতে খুব একটা লাভ হয়নি। তিনি নিজ আগ্রহেই সেসবের বিস্তারিত বিবরণ, সেগুলো সম্পর্কে তাঁর মতামত দিয়ে যাচ্ছিলেন একটু পর পর। আমি বিশ্বাস করি, আফগানিস্তানে শান্তি ফিরিয়ে আনার আলোচনায় তাঁর মতো এমন বিচক্ষণ একজন কূটনীতিবিদের সমস্ত মেধা শুধু অপচয়ই হয়েছে। কারণ তাঁর পরিশীলিত সংস্কৃতি, মেধা আর ন্যায়পরায়ণতা বোঝার মতো যোগ্যতাই অসভ্য আমেরিকানদের নেই। সেই তিনিই যখন আমার ওপর আস্থা রাখেন যে তাঁর অসহ্য এবং কখনো কখনো বিধ্বংসী যন্ত্রণাগুলো আমি অনুভব করে নিতে পারব, তখন তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ না হয়ে পারি না।

গুয়ান্তানামোর সাবেক কারাবন্দী জারাল্লা আল মারি-র অবদান ছাড়া এই বইটি কখনোই প্রকাশ করা সম্ভব হতো না। কারণ তিনিই প্রথম শেখ

আবদুস সালাম জাইফকে CAGE সম্পর্কে জানিয়েছিলেন। বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি শেখ এবং তাঁর পরিবারের প্রতিও।

নাজিম আদম আর বিলাল আবদুল করীম বইটির পেছনে মূল্যবান সময় ব্যয় করেছেন। মোয়াজ্জেম বেগ এবং ভিক্টোরিয়া ব্রিটেনের কাজ ভূমিকাটি লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

আরও ধন্যবাদ জানাই CAGE Africa, CAGE UK-এর পরিচালকবৃন্দকে ও CAGE Sisters গ্রুপকে। সেই সাথে ধন্যবাদ প্রচ্ছদ শিল্পী শাদলী সালুতকেও।

জুলেখা আদম দিনাত

শেখ আবদুস সালাম জাইফের সংক্ষিপ্ত জীবনী

আবদুস সালাম জাইফের জন্ম আফগানিস্তানের কান্দাহারে, ১৯৬৭ সালের পয়লা জানুয়ারি। ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরে ৮৫ হাজার সৈন্য নিয়ে করা রুশ আক্রমণের ফলে তিনি বাধ্য হন পাকিস্তানে পালিয়ে যেতে।

১৯৮৩ সালে তরুণ আবদুস সালাম সোভিয়েত বিরোধী দলের সাথে যুক্ত হন। ১৯৮৪ সালে পড়াশোনা চালিয়ে নেওয়ার জন্য কোয়েটায় গমন করেন। ষোল বছর বয়সে পাকিস্তানের ISI-এর কাছে অস্ত্র চালনার কৌশল শিখে নেন এবং কান্দাহার ফিরে আসেন মুজাহিদ বাহিনীর সাথে যোগ দেওয়ার জন্য।

১৯৮৪ থেকে ১৯৮৯ এর সময়টা ছিল এই মুজাহিদের জন্য কিছুটা কঠিন। এক লড়াইয়ে আহত হয়ে তিনি পাকিস্তান আসেন চিকিৎসা নিতে। চিকিৎসা শেষে কান্দাহার ফিরে গিয়ে আবারও যুদ্ধে যোগ দেন। খুসাব অঞ্চলে রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে শেষ সমরে ছিল তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ। যুদ্ধ শেষে আবদুস সালাম কান্দাহারে নিজ বাড়ি ফিরে আসেন। কিন্তু গৃহযুদ্ধ এবং ভয়াবহ ভূমিকম্পের ফলে ১৯৯১ সালে তিনি আবারও পাকিস্তান চলে যেতে বাধ্য হন। ১৯৯২ সালে কান্দাহারের এক মসজিদে ইমামের দায়িত্ব নিয়ে আবারও ফিরে আসেন। রাশিয়ানদের বিদায়ের পর যুদ্ধকালীন নেতৃবৃন্দের দলাদলি আর বিশৃঙ্খলার জের ধরে তিনি অংশ নিতে শুরু করেন বিভিন্ন বিতর্কে। আর এর হাত ধরেই জন্ম নেয় তালিবান, ফিরে আসে শান্তি-শৃঙ্খলা।

১৯৯৬ সালে তালিবান কান্দাহারের দখল নিয়ে নেয়। আবদুস সালাম তালিবান সরকারের বিচার বিভাগে কাজ করতে শুরু করেন। সাতাশ বছর বয়সে তাঁকে হেরাতের ব্যাঙ্কসমূহের দায়িত্ব দেওয়া হয়, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই মোল্লা মোহাম্মদ ওমর তাঁকে কাবুলের প্রতিরক্ষা বিভাগের প্রশাসনিক পরিচালক হিসেবে ডেকে পাঠালে তিনি সেই দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই

সময়ের মধ্যেই তালিবান হেরাত, কাবুল এবং মাজার-ই-শরীফের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়।

১৯৯৭ থেকে ১৯৯৯-এর মধ্যে খনিজ ও শিল্প মন্ত্রণালয় এবং যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের মতো বিভিন্ন জটিল পদে তাঁকে বসানোর ব্যাপারে তাঁর ওপর রাখা আস্থার প্রতিদান সুচারুরূপে দিয়েছেন তরুণ এই নেতা।

১৯৯৯ সালের এক সামরিক অভ্যুত্থান পারভেজ মোশাররফকে পাকিস্তানের ক্ষমতায় বসায়। তখন আবদুস সালাম ইসলামাবাদে আসেন তালিবান সরকার কর্তৃক রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিযুক্ত হয়ে।

২০০১ এর ৯/১১ ঘটনার পর আবদুস সালামকে বন্দী করে পাঠানো হয় গুয়ান্তানামো বে কারাগারে।

ভূমিকা

"সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেই মানুষ নির্মম বাস্তবতাকে ভুলে থাকে। সমাজের আর সবাই যাদেরকে বর্জন করেছে, তারা কী করে বিশ্বাস করবে যে এই ঝঞ্ঝাট তাদের জীবনের বিস্তৃত অধ্যায়ের কয়েকটি ছেঁড়া পাতা মাত্র! কোন ভরসায় তারা ভাববে যে এই অগ্নিপরীক্ষার দিন একসময় শেষ হবে? বাস্তবতাকে পাশ কাটিয়ে তাদেরকে কীভাবে আপনি বিশ্বাস করাবেন যে এসব থেকে মুক্ত হয়ে তারা আরও শক্তিশালী, আরও ভালো মানুষে পরিণত হবে? 'আশা'কে তাই বলা যায় ব্যথানাশক-মিশ্রিত এক মধুর ভ্রান্তি। এর থেকে বেঁচে থাকার জন্য আমরা তাই নিজেদের প্রস্তুত করে রাখতাম আরও বাজে ভবিষ্যতের জন্য। এই চরম বাস্তবতা যারা বুঝতে পারেনি, তাদেরকেই ডুবতে হয়েছে হিংস্র এবং নির্মম হতাশায়।"

তাহের বিন জিলুন
দ্য ব্লাইন্ডিং এবসেন্স অফ লাইট

১৯৮৬ সালে *নিউইয়র্ক টাইমস* পত্রিকায় জে এম কোয়েজ্জির লেখা এক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। *ইনটু দ্য ডার্ক চেম্বার* শিরোনামের সেই প্রবন্ধে একজন স্বাভাবিক মানুষের জীবনে টর্চার চেম্বারের কেমন প্রভাব পড়ে সে সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের সন্দেহে গ্রেফতার হওয়া বন্দীদের ক্ষেত্রে যেটাকে ভিক্টোরিয়া ব্রিটেন প্রাক-দণ্ডাদেশ এবং প্রাক-সাজা বলেছেন সেটা নিয়ে কোয়েজ্জি নিরীক্ষা চালিয়েছেন। "নির্যাতন কক্ষের আখ্যান আমাদের সামনে এক তীব্র এবং স্পষ্ট রূপক তুলে ধরে। ঠিক যেমন স্বৈরাচারী কর্তৃপক্ষের হাতে তার শিকারদের অবস্থা হয়, তেমনটাই ঘটে সেসব নির্যাতন কক্ষে। টর্চার সেল-এ একজন মানুষের শরীরের ওপর *বৈধ অন্যায়*-এর আশ্রয় নিয়ে এমন সীমাহীন শক্তি প্রয়োগ করা হয়, যার ফলে সে

পুরোপুরি ধ্বংস না হলেও অন্তত তার ভেতরের প্রতিরোধ ক্ষমতাটুকু একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়।"

ইউনাইটেড স্টেইটস সিনেট কমিটি রিপোর্ট অন টর্চার-এ আংশিকভাবে তথাকথিত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর চালানো পাশবিকতার কথা উঠে এসেছে। বহু গোপনীয়তা ফাঁসের বিপর্যয় ঠেকাতে সুকৌশলে রিপোর্টটি প্রকাশ করা হয় ২০১৪ সালের শেষভাগে। রিপোর্টটির 'মুখবন্ধে' সিনেট কমিটির চেয়ারম্যান 'সিনেটর ডায়ানা ফেইনস্টাইন' সিআইএ'র এসব কাজকে অত্যাচার হিসেবে অভিহিত করেন। কিন্তু একই সাথে তিনি বলেন, "৯/১১-এ সৃষ্ট আতঙ্কই সংস্থাটিকে যুক্তরাষ্ট্রের আইন, চুক্তিভিত্তিক বাধ্যবাধকতা এবং স্বাভাবিক মূল্যবোধের বাইরে গিয়ে নির্দয় জিজ্ঞাসাবাদ করতে বাধ্য করেছে।" এই রিপোর্টটিকে 'ভবিষ্যতের জন্য সতর্কবার্তা' হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

তার এই বক্তব্যের মধ্যে আসলে সেসব অপহৃত এবং বিদেশী বন্দীদের ওপর চালানো তাদের অত্যাচারকে বৈধতা দেওয়া বা সেগুলোকে না দেখার ভান করার মতো অস্পষ্ট এক ধোঁয়াশা সৃষ্টির অপপ্রয়াস ধরা পড়ে। তাদের সেসব কুকীর্তি সমস্ত আন্তর্জাতিক আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। এগুলো মধ্যপ্রাচ্য এবং অন্যান্য দেশের শান্তিপূর্ণ সম্প্রীতির জন্যও হুমকিস্বরূপ।

প্রকাশিত নথিতে উচ্চপদস্থ কোনো কর্তাব্যক্তিকেই দোষী সাব্যস্ত করা হয়নি। অথচ এরাই তাদের রাজনৈতিক ফায়দা লোটার জন্য, আল-কায়েদাকে আপাত দৃষ্টিতে ধ্বংস করার জন্য সেইসব নির্মম বলপ্রয়োগের অনুমতি দিয়েছিলেন। রিপোর্টটিতে জড়িতদের ব্যাপারে পুনর্তদন্ত বা নিরীহ বন্দীদের কোনোরকম ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যাপারেও কোনো নির্দেশনা ছিল না। এমনকি সেখানে এলোপাথাড়ি বন্দীদেরকে বেকসুর খালাস দেওয়ার বিষয়েও পরিষ্কার করে কিছু বলা হয়নি।

উক্ত রিপোর্টে এসব ঘটনার সাথে হোয়াইট হাউজের সম্পৃক্ততা নিয়েও ভালোভাবে নিরীক্ষার অভাব চোখে পড়ে। "আমরা কিছু লোকের ওপর নির্যাতন চালিয়েছি" বারাক ওবামার এমন স্বীকারোক্তি কেবলই দায়সারা গোছের একটু অনুকম্পা প্রদর্শনমাত্র। এছাড়া কুখ্যাত গুয়ান্তানামো বে

কারাগার বন্ধ করার জন্য চারিদিক থেকে আসা আহ্বানকে তো ওবামা খুব বেশি একটা গুরুত্ব কখনোই দেননি।

গুয়ান্তানামো কারাগার মানুষের ভেতরের পশুত্বটাকে বের করে আনে। নাথানিয়েল হথোর্ন কারাগারকে 'কালো ফুল' বলে অভিহিত করেছেন, যেখানে 'কিছু লোক আইন ভঙ্গ করে' আর বাকিদেরকে 'আইন নিজেই ভেঙে ফেলে।' ৯/১১-এর ঘটনার পর থেকে কিউবার কাছাকাছি গড়ে তোলা এই ভয়ঙ্কর জেল ছাড়াও বিভিন্ন দেশে এমন আরও বহু গোপন স্থাপনা তৈরি হয়েছে। আর এক্ষেত্রে আমেরিকাকে সাহায্য করেছে মিথ্যুক, পুতুল শাসক এবং অর্থলোভী কিছু চক্র।

অপহরণ এবং তারপর সরকারের আনুষ্ঠানিক অনুমতি ছাড়াই সীমান্ত দিয়ে কোনো ব্যক্তিকে অন্য দেশের কাছে হস্তান্তর করাটা এখন 'নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার'-এর ব্যবসাতে পরিণত হয়েছে। এভাবে বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে চিহ্নিত কিছু নারী, পুরুষ এমনকি শিশুদের ধরে ধরে এনে একত্র করা হচ্ছে। পরবর্তীতে তাদের ওপর 'শত্রু যোদ্ধা', 'সন্ত্রাসী' বা 'ইসলামিস্ট' তকমা লাগিয়ে তথাকথিত 'উচ্চতর তদন্ত' বা 'সংবাদ সংগ্রহ' করার কথা বলা হচ্ছে। চেনা-পরিচিত পৃথিবী থেকে তারা হারিয়ে যায় কোনো সূত্র না রেখেই। তাদের বিরুদ্ধে না থাকে কোনো অপরাধ করার প্রমাণ, আর না থাকে আত্মপক্ষ সমর্থন করে ন্যায়বিচার পাওয়ার কোনো সুযোগ।

এসব স্থাপনার গোপনীয়তা দেখলেই বোঝা যায়—এদের অপকর্ম সম্পর্কে জানার এখনও অনেক বাকি। ৯/১১-এর পর থেকে ইরাক যুদ্ধ কিংবা আফগানিস্তানে আক্রমণের ফলে অসংখ্য রাখাল, বৃদ্ধ, শ্রমিক, নারী, শিশু, সাংবাদিক-পরিচয় নির্বিশেষে যে কেউ ঢুকে পড়ছে এমন জেল জীবনের দুর্বিষহ নেটওয়ার্কে।

গুয়ান্তানামো বে'র কারাগারের খোঁয়াড়ের মতো খাঁচাগুলো আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদকে ফুটিয়ে তোলে। একে বন্ধ করলেই আমেরিকার গণতন্ত্র আর ক্ষমতার আসল রূপ বেরিয়ে আসবে। এখানেই হিংস্রতা হয়েছে অনুমোদিত, পেয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ। টর্চার রিপোর্টে লেখা হয়েছে সেগুলোর লোমহর্ষক বিবরণ। অথচ একবারের জন্যও ক্ষমা চাওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি তারা।

মুখোশ, শিকল এবং রক্তাক্ত দেয়ালগুলো এমন এক দাপুটে ক্ষমতার কথা মনে করিয়ে দেয়, যা অনেক অমানবিক কাজেরই বৈধতা দিয়েছে। সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা, ঘুমুতে না দেওয়া, অনাহারে রাখা, ওয়াটারবোর্ডিং, মারধর করা, কুকুরের আক্রমণ চালিয়ে কাল্পনিক হুমকি এবং ষড়যন্ত্রের স্বীকারোক্তি আদায়—এ সবকিছুই সে ক্ষমতার কাছে বৈধ। গুয়ান্তানামো কারাগারে নিক্ষিপ্ত হওয়ার আগে বহু আফগানই বাগরাম, কান্দাহার এবং সল্ট পিটে 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ'-র হিংস্র ভাষার সাথে পরিচিত হয়েছে। এদিকে খাঁচার মধ্যে পুরে একজন মানুষকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নেওয়াটা ছিল জেনেভা কনভেনশনে উল্লেখিত একজন বন্দীর প্রাপ্য অধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

তথাকথিত 'জিজ্ঞাসাবাদের বর্ধিত কৌশল' নাম দিয়ে করা বিভিন্ন অত্যাচার যাঁর ওপর প্রথম প্রয়োগ করা হয়, তাঁর নাম আবু জুবাইদাহ। বিচার বিভাগের লিগ্যাল কাউন্সিল অফিস থেকে তাঁকে অত্যাচার করার সম্মতি দেওয়া ছিল। এই কাউন্সিল অফিসের কুখ্যাত 'শাস্তি বিধান'-এ জিজ্ঞাসাবাদকারী এবং গোয়েন্দা সদস্যরা কী কী পদ্ধতির অনুসরণ করবে তার বিস্তারিত দিকনির্দেশনা দেওয়া আছে। এসব পদ্ধতির মধ্যে শারীরিক, মানসিক সব ধরনের অত্যাচারের বর্ণনা আছে।

ওয়াশিংটন পোস্টের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী আবু জুবাইদাহকে প্রথমে থাইল্যান্ডের এক ব্ল্যাক সাইটে ৪৭ দিন আটকে রাখা হয়েছিল। নিউইয়র্ক টাইমসের এক অনুসন্ধান থেকে জানা যায় কীভাবে ২০০২ সালের ৪ঠা আগস্ট পর্যন্ত সিআইএ তাঁর ওপর ভয়ঙ্কর অত্যাচার চালিয়ে গেছে। ওরা তাঁকে ধাক্কা দিয়ে দেয়ালের সাথে চেপে ধরত, ঠাসাঠাসি করে কফিন আকৃতির একটি বাক্সে নিয়ে আটকে রাখত। এরপর শুরু হতো ওয়াটারবোর্ডিং, যা চলতো যতক্ষণ না তিনি কাশতে কাশতে বমি করে ফেলতেন কিংবা তাঁর হাত-পায়ে প্রবল খিঁচুনি শুরু হতো। ধারণা করা হয় ঐ একমাসে তাঁর ওপর ৮৩ বার এমন ওয়াটারবোর্ডিং চালানো হয়।

তার অনেক পরে তদন্ত ও অনুসন্ধানের ফলে জানা যায় যে, তাঁর ওপর আল-কায়েদার একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হওয়ার ব্যাপারে আনা অভিযোগের কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। অথচ আজও তিনি গুয়ান্তানামো

কারাগারে বিনা বিচারে বন্দী হয়ে আছেন। তাঁর আইনজীবী জানিয়েছেন, আবু জুবাইদাহ বর্তমান সিনেট রিপোর্টে তাঁর ওপর হওয়া সমস্ত অত্যাচারের জবানবন্দী দিতে সম্পূর্ণ অনাগ্রহী। কারণ, তিনি বিশ্বাস করেন, এগুলো কখনোই ফলপ্রসূ হবে না।

CIA-র গোপন রেকর্ড থেকে জানা যায়, খালিদ শাইখ মুহাম্মাদের ওপর চালানো ওয়াটারবোর্ডিং আরও বেশি ভয়ানক ছিল। ধারণা করা হয়, CIA যতটুকু প্রকাশ করেছে, তাদের অত্যাচারের পরিমান আসলে এরচেয়ে অনেকগুণ বেশি।

CIA-র অনুসন্ধানকারী কমিটি কিছু ছবি উদঘাটন করেছে যেখানে কয়েদখানার পাশে ওয়াটারবোর্ডিং সরঞ্জামাদিসহ পানির বালতি পাওয়া গেছে। যদিও CIA পূর্বে এধরনের ওয়াটার বোর্ডিংয়ের কথা অস্বীকার করেছে।

'স্লিপ ডিপ্রাইভেশান' হলো একজন কারাবন্দীকে প্রায় ১৮০ ঘণ্টা বা সাতদিন পর্যন্ত টানা ঘুমুতে না দেওয়া। এক্ষেত্রে বন্দীকে সাধারণত দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। কখনো তাঁর হাত মাথার ওপর শেকল দিয়ে বেঁধে টানটান করে রাখা হয় যেন তিনি ঘুমুতে না পারেন। CIA বন্দীদের একরকম বিশ্বাস করতে বাধ্য করেছিল যে, তাঁরা কখনো এই বন্দীদশা থেকে মুক্তি পাবেন না। মুক্তি যদিও পান, তা কেবল কফিনে ঢোকার পরই।

কিছু কিছু বন্দীকে 'ডানজন' (বা অন্ধকূপ) নামের বিশেষ কারাগারে নগ্নাবস্থায় শেকলে বেঁধে আটকে রাখা হতো। সম্পূর্ণ অন্ধকার সেই কারাগারে বাজানো হতো উচ্চশব্দের মিউজিক। মলমূত্র ত্যাগ করার জন্য ছিল শুধুই একটি বালতি। কখনো কখনো তাদের মুখ ঢেকে করিডোরে নিয়ে যাওয়া হতো এবং দেহের ওপরে ও নিচে ঘুষি আর ক্রমাগত চড় থাপ্পড় দেওয়া হতো। অন্তত পাঁচজন কয়েদীকে ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া পায়ুপথ দিয়ে নলের মাধ্যমে খাবার দেওয়া হয়েছে এবং তা শুধুই তাঁদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য।

পরবর্তীতে দেখা গেছে, যে কয়েদীদের ওপর CIA অত্যাচারের এসব ভয়ানক কৌশল প্রয়োগ করেছে, তাঁদের বিভিন্ন ধরনের মানসিক সমস্যা

দেখা দিয়েছে। হ্যালুসিনেশান, মস্তিষ্কবিকৃতি, অনিদ্রাসহ আরও অনেক রকমের মানসিক রোগ।

টর্চার রিপোর্ট থেকে এসব অত্যাচারের অনেক অংশ সরিয়ে ফেলা হলেও এতে গুয়ান্তানামোর অন্ধকার নির্যাতন কুঠুরিগুলোতে চালানো অত্যাচারের এবং একই সাথে একটি সাম্রাজ্যবাদী সরকারের নিজের দেশকে রক্ষার নামে চালানো হিংস্রতার আভাস পাওয়া যায়। কিছু বন্দীকে হয়তোবা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তারপরও তাঁদের স্মৃতি থেকে কি আর সেসব লোমহর্ষক ঘটনাগুলো চিরদিনের জন্য মুছে দেওয়া যায়?

'দার্শনিক নিৎশে' বলেছেন, "স্মৃতি কখনো রক্ত, অত্যাচার এবং ত্যাগ ছাড়া অর্জন করা যায় না। নিষ্ঠুরতার লক্ষ্যই হলো মানুষের মর্যাদা কেড়ে নেওয়া। তার পরিবার ও দেশের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়ে দেওয়া। এর কষ্ট ও ভোগান্তি কখনো ভোলা যায় না। সাধারণত কষ্টকর স্মৃতিগুলোই মনে বেশি রয়ে যায়।"

২০১৫ সালের জানুয়ারিতে যখন Mahamedou Ould Slahi এবং Abu Jubaidah-এর নোটবুক প্রকাশিত হয়, তখনও তাঁরা সেখানেই বন্দী ছিলেন। এই লেখাগুলো তাঁদের ওপর চালানো নজিরবিহীন অত্যাচারের সত্যতা প্রমাণ করে। একটি ভুল ধারণা প্রচলিত আছে-অত্যাচার বন্দীকে আজ্ঞাবহ, দুর্বল ও নমনীয় করে। কিন্তু আমরা জানি এটা সঠিক নয়; বাস্তবতা এর পুরোপুরি বিপরীত। যেখানেই বন্দীদের অত্যাচার করা হয়েছে, সেখানেই তাঁদের ওপর এর বিরূপ প্রভাব পড়েছে এবং এই পদ্ধতি পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে।

আবদুস সালাম জাইফের কথাই ধরা যাক। তাঁর বন্দীজীবনের স্মৃতি জুড়েই আছে শুধু অপহরণ, অত্যাচার, কারারোধ। তাঁর লেখায় তিনি সৈন্যদের অত্যাচারকে উল্লেখ করেছেন—তাঁকে 'শিক্ষা' দেওয়ার জন্য প্রযুক্ত 'শাস্তি' হিসেবে। আর সম্ভবত এসব করা হতো ধৃত ব্যক্তির ইচ্ছা অনিচ্ছাকে নিজেদের অধীনে নিয়ে আসার জন্য। নিৎশে এমন অধীনস্থ মানুষদের নাম দিয়েছেন 'ম্যান-অ্যানিম্যাল'। এরা কেবল টিকে থাকার জন্যই বেঁচে থাকে। আবদুস সালামের সাহসিকতা, সম্মান এবং বন্দীদের জন্য সহানুভূতি তাঁর

এমন অমানুষিক ও প্রতিকূল অবস্থায়ও নেতৃত্বদানের কূটনৈতিক প্রজ্ঞাকেই ফুটিয়ে তোলে।

এমন প্রতিকূল অবস্থায়ও অনেক কয়েদীই আশ্চর্যজনকভাবে তাঁদের অবস্থানে অবিচল ও অভঙ্গুর ছিলেন। মহান আল্লাহর ওপর সন্দেহাতীত বিশ্বাসের জন্যই এমন কঠিন অবস্থাও তাঁরা সহ্য করে যেতে পেরছেন। শারীরিক অত্যাচার এবং মানসিক যন্ত্রণার কষ্টও তাঁরা ভুলে থাকতে পেরেছিলেন শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার করুণার ওপর আস্থা রাখার ফলে। একাকী নামাজে বা যতটুকু সম্ভব জামাতবদ্ধ হয়ে তাঁরা নিজের সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছার কাছে সমর্পণ করতে পেরেছিলেন। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করে তাঁরা সান্ত্বনা এবং শক্তি পেতেন। বিশেষ করে সূরা ইউসুফ ছিল তাঁদের প্রেরণার মূল উৎস।

মোয়াজ্জেম বেগ তাঁর বই 'এনিমি কমব্যাটান্ট'[১]-এ তাঁর গুয়ান্তানামো বে-এর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লিখেছেন, "হতাশাকে ইসলামে পাপ হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু বাগরামে ২০০২ সালের মে মাসে সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতিতে আমি নিজেকে হতাশার অতলে নিমজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারিনি। আবার গুয়ান্তানামোতে গিয়েও আমার একই অবস্থা হয়েছিল। স্টিলের জালি দিয়ে আবৃত একপাশের ছোট একটি জানালাসহ ছোট একটি রুম, যেখানে চারপাশের দেয়াল আর ছাদ এবং মেঝেও স্টিলের; স্টিলের বিছানা, টয়লেট—যেগুলো ধবধবে সাদা, একেবারে নতুনের মতো, সেই রুমে প্রথমবারের মতো গিয়েও আমি হতাশ হয়েছিলাম।"

নবী ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঈমান এবং নিজেকে এক আল্লাহর ইচ্ছার ওপর সমর্পণ করার দৃষ্টান্ত অনেক কয়েদীকে অনুপ্রাণিত করেছিল তাঁদের দুঃখজনক স্মৃতি, আটককারীদের চালানো অত্যাচার, বিকৃত অমানবিকতা, মৃত্যুর ভয় এবং তাঁদের নাকাল অবস্থা সহ্য করে নিতে। অবশেষে জনগণের সামনে প্রকাশ করা সিনেটের প্রতিবেদন এবং ইরাকের আবু গারিব কারাগারে অশ্লীল ও উলঙ্গ অবস্থায় রাখা বন্দীদের প্রকাশিত ছবি

---

১. বইটির অনুবাদ প্রজন্ম পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

তাঁদের ওপর চালানো নিপীড়নের সাক্ষী হিসেবে কাজ করে। এগুলোর মাধ্যমে আমেরিকার দ্বারা অনেকেরই অপহরণ, মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ, হঠাৎ গায়েব হয়ে যাওয়া ও অন্যান্য বর্বরতার শিকার হওয়ার নীল নকশাই প্রকাশ পেয়েছে।

বছরের পর বছর ধরে মৌখিক এবং যৌন নির্যাতনের শিকার হয়ে তাঁরা জীবনের প্রতি অসীম বিতৃষ্ণা এবং ভীষণ লজ্জায় পড়ে গিয়েছিলেন। অথচ তাঁদেরও অন্য সাধারণ মুসলিমদের মতো যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার কথা ছিল। যাঁরা এমন নিপীড়নের শিকার হয়েছেন তাঁরা কেবল আল্লাহর ক্ষমার দিকেই চেয়ে ছিলেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন,

"আমি যাকে ইচ্ছা তার প্রতি দয়া করে থাকি। আর আমি সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করি না।" (সূরা ইউসুফ, ১২ : ৫৬)

কয়েক শতাব্দী আগে আফগানিস্তানের এক তরুণ লেখক 'জামী' হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের কারাবন্দীত্বকে এভাবে বর্ণনা করেছেন—

ইউসুফকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হলো। আর তার জেলার ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক। অথচ যুবক ইউসুফ কারাগারে যখন প্রবেশ করলেন, তাঁর আত্মা ছিল জীবনীশক্তিতে ভরপুর। অন্যান্য কারাবন্দীরা তাঁর সংস্পর্শে এসে অনুভব করল, তারা যেন জীবনের হারানো উদ্যম ও অনুভূতি ফিরে পেয়েছে। দুঃখ-কষ্টের এই কারাগার এক মহান ব্যক্তির আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ, উদ্দীপনা আর সজীবতায় যেন ভরে গেল। সেই পাগল-করা সৌন্দর্যের রাজা কারাগারে প্রবেশের সাথে সাথে বন্দীদের মধ্যে শোরগোল শুরু হয়ে গেল। তারা আনন্দে নিজেদের শিকলে বাড়ি দিয়ে ঝনঝন আওয়াজ করতে লাগল। বেড়িগুলোকে তাদের কাছে আর প্রতিবন্ধক মনে হলো না। হঠাৎই যেন তাদের যন্ত্রণা ও মর্মপীড়া আনন্দ ও উৎফুল্লতায় রূপান্তরিত হলো এবং পাহাড়সম দুঃখ-দুর্দশা খড়কুটোর ন্যায় হালকা মনে হতে লাগল। কারণ ফেরেশতার মতো মানুষেরা যেখানেই গমন করেন, জাহান্নাম যেন সেখানেই জান্নাতে পরিণত হয়। প্রজ্বলিত আগুনের গোলা রূপান্তরিত হয় ফুলের বাগানে।

আবদুস সালাম যাঈফ তাঁর বই 'My Life with Taliban (2010)'-এ গুয়ান্তানামো বে কারাগারকে জীবন্তদের কবর বলে উল্লেখ করেছেন। এটি সেই আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ যেখানে ১৯৭৯ সালে আফগানিস্তানে রাশিয়ার আক্রমণের আগের সময়কার স্বতন্ত্র অন্তর্দর্শন এবং তরুণ মুজাহিদ হিসেবে ১৯৮৩ সালের সোভিয়েত বিরোধী জিহাদের সময় তাঁর জীবনের ঘটনাগুলোর বর্ণনা আছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পরাজয়ের পর সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা তালিবান গঠনে ভূমিকা রেখেছে। যার উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধরত গোত্রগুলোর মধ্যে মীমাংসা করে দেওয়া এবং যুদ্ধপরবর্তী অরাজকতা দূর করে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। যাঈফকে পরবর্তীতে তালিবান সরকারের কর্মকর্তা থেকে মন্ত্রী পদে আসীন করা হয় এবং সবশেষে পাকিস্তানে রাষ্ট্রদূত হিসেবে প্রেরণ করা হয়। ৯/১১-এর ঘটনা এবং তার পরবর্তীতে ওসামা বিন লাদেনকে খুঁজে বের করার জন্য 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' নাম দিয়ে আফগানিস্তান ও ইরাকে মার্কিনীদের হামলার সময়ও যাঈফ উক্ত পদে সমাসীন ছিলেন।

Victoria Brittain তাঁর বই Shadow Lives-এ লিখেছেন,

"আবদুস সালাম যাঈফ ২০০১ সালে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিযুক্ত থাকাকালেই এসব যুদ্ধের পূর্বাভাস দিয়েছিলেন। তিনি টুইন টাওয়ারে আল-কায়েদার করা হামলাকে 'পার্ল হারবারে' জাপানের করা হামলার সাথে তুলনা করেন এবং নিজ দেশের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে কাঁদতে কাঁদতে বলেন, আফগানিস্তানের অবস্থাও জাপানের মতো হবে। তালিবান নেতা মোল্লা মোহাম্মদ ওমরের সাথে টেলিফোনে আলোচনা করার পর যাঈফ তালিবানের প্রেস রিলিজে কী লেখা হবে সে ব্যাপারে নির্দেশনা দেন। তিনি এ হামলার নিন্দা জানিয়ে দায়ী ব্যক্তিদের বিচারের আওতায় আনার কথা ব্যক্ত করেন।"

যাঈফ নিজেই এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সহানুভূতি ও কূটনৈতিক প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তবুও পরবর্তীতে তিনি নিজেই 'ওয়ার অন টেরর'-এর একজন ভুক্তভোগী হয়ে পড়েন। যদিও ২০০১ সালের সেই আক্রমণের সাথে জড়িতদের নিয়ে অনেক প্রশ্নই রয়ে যায়।

২রা জানুয়ারি ২০০২ সালে আবদুস সালাম যাঈফ পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থা ইন্টার সার্ভিস ইন্টেলিজেন্স (ISI) কর্তৃক অপহৃত হন। তাঁকে অপহরণ, তাঁর ওপর চালানো অত্যাচার এবং কোনো অপরাধ ছাড়া কারাগারে বন্দী

করে রাখার ঘটনাগুলো অত্যন্ত বেদনার্ত শব্দমালায় এ বইটিতে উঠে এসেছে। প্রায় চার বছর পর ১১ই সেপ্টেম্বর ২০০৫ সালে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। এরপর কেটে গেছে আরও দশ বছর। অথচ অপহরণের সময় এবং জেলে থাকা অবস্থায় তাঁর ওপর চালানো নির্যাতনের স্মৃতি আজও তাঁর হৃদয়ে গভীর এক ক্ষত হিসেবে রয়ে গেছে।

বইটির এই দক্ষিণ আফ্রিকান পুনর্মুদ্রণে ঐ বছরগুলোতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও আত্মমর্যাদা হারানোর অবর্ণনীয় বিবরণ উঠে এসেছে। এগুলো আমাদেরকে একজন নিষ্পাপ ও সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচারের কারণে যে প্রভাব পড়ে তার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। একজন মানুষ, যিনি কিনা তাঁর প্রিয় আফগানিস্তানে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার কাজে একান্তভাবে নিয়োজিত ছিলেন, তিনি সোভিয়েত বাহিনীকে হটিয়ে দেওয়া মুজাহিদদেরকে আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে একটি বিধর্মী সৈন্যবাহিনীর হাতে আক্রান্ত এবং বিধ্বস্ত হন।

একজন কূটনীতিক হিসেবে তাঁকে যে ইমিউনিটি (আইন থেকে মুক্তি) দেওয়ার কথা ছিল, তা দেওয়া হয়নি। উল্টো আরও অনেক অসম্মান করা হয়েছে। এটা আসলেই হাস্যকর যে, তাঁর সহানুভূতিপূর্ণ কূটনৈতিক জ্ঞান ও উচ্চ ধীশক্তি শান্তি বন্দোবস্তের কাজে আপসে ব্যবহার করা যায়নি। আবার তালিবানের সাথেও আমেরিকা পারস্পরিক বিশ্বাসের সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেনি। আর না বন্ধ করা গেছে কেবলমাত্র কাল্পনিক বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে টুইন টাওয়ার হামলার অভিযোগে সাধারণ আফগান মানুষের ওপর আমেরিকার সামরিক হামলা চালানো।

যদি কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা যেত তাহলে হয়তো ১৫ বছরেরও অধিক সময় ধরে চালানো ধ্বংসকাণ্ড বন্ধ হতো আরও বহু আগেই। ফলে বাঁচানো যেত হাজার হাজার নিরীহ মানুষের জীবন।

দক্ষিণ আফ্রিকাবাসীর কাছে এই বই অপরিসীম তাৎপর্য বহন করে। কারণ তাদের ভাগ্যেও একসময় জাতিবিদ্বেষী সরকারের রোষানলে পড়ে বন্দীত্ব, অত্যাচার এবং নির্বিচারে হত্যা হওয়া ছিল নৈমিত্তিক ব্যাপার। পরস্পরের এ মিল যেন নাড়ির বাঁধনের মতোই। জনমানবশূন্য, সভ্যতা থেকে অনেক দূরে অবস্থিত হওয়ায় রোবেন আইল্যান্ডে নেলসন মেন্ডেলার

জীবনের সাথে গুয়ান্তানামো বে কারাগারে বন্দী মানুষগুলোর জীবনকে তুলনা করা যেতে পারে। কেপ কোস্টের তীরে সাম্রাজ্যবাদী ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সেই কারাগারটি বানিয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে যেকোনো গলা উঁচুকারীকেই শাস্তি দেওয়ার জন্য।

১৭১২ সালে Moluccan সাগরের Tidone দ্বীপে জন্ম নেওয়া ইমাম আব্দুল্লাহ কাজী আব্দু সালামকে ডাচরা গ্রেফতার করেছিল। সাথে তাঁর তিনজন স্বদেশীও ছিল। তাঁদেরকে রোবেন দ্বীপে বন্দী করে রাখা হয়। এদের দুজন সেখানেই মারা যান। এদিকে নিজের দেশে ইমাম আব্দুল্লাহকে Tuang Guru হিসেবে সম্মানের সাথে স্মরণ করা শুরু হয়ে গিয়েছিল। তিনি একজন হাফেজ ছিলেন এবং বন্দী অবস্থায়ই স্মৃতি থেকে পুরো কুরআনের কপি তৈরি করেছিলেন। ৮১ বছর বয়সে মুক্তি পাওয়ার পর তিনি নিজেকে সাউথ আফ্রিকায় ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজে নিয়োজিত করেন। কাজী আব্দু সালাম এবং আবদুস সালাম যাঈফ-এর নামের মধ্যে অদ্ভুত মিল। তাছাড়া ইসলামের প্রতি তাঁদের আনুগত্য এবং ঈমানের কারণে তাঁরা যে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন তা তাঁদের মহত্বকে আরও বাড়িয়ে তোলে।

আফ্রিকায় জাতিগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলাকালীন দুজন মুক্তিযোদ্ধার ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন সিনেট রিপোর্টে প্রকাশ করা হলে দেখা যায়, নিপীড়নগুলো অনেকটা এখনকার মতোই। এরপর যখন গভীর পর্যবেক্ষণে নিয়ে আসা হয় তখন অবৈধভাবে অপহরণ এবং বন্দীদশায় বর্বর হত্যাকাণ্ডের পরিব্যাপ্তি লক্ষ্য করা যায়। কৃষ্ণাঙ্গদের মাঝে সচেতনতা গড়ে তোলার আন্দোলনের সাথে জড়িত স্টিভ বিকো এবং আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের একজন সদস্য আহমেদ তিমুলের ওপর চালানো নিপীড়ন এবং গুপ্তহত্যার ওপর মেরুদণ্ড হিম করে দেওয়া রিপোর্ট ২০০৫ সালের জুলাই মাসে গুয়ান্তানামোতে তিনজন ব্যক্তির নির্মমভাবে শহীদ হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে। শাইখ যাঈফ গুয়ান্তানামোর ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। "অনেক পরে আমরা জানতে পারি যে, ব্রিটিশ নাগরিক শাকের আমের সেই একই রাতে অল্পের জন্য শ্বাসরোধ হয়ে মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গিয়েছেন। যদিও আমেরিকানরা সেই তিনজনের মৃত্যুকে আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু 'ট্রুথ এন্ড রিকন্সিলিয়েশন কমিশন' দক্ষিণ আফ্রিকার জাতিগত

দাঙ্গা এবং উত্তেজনা শেষ হওয়ার পর সত্য ঘটনা প্রকাশ করে। সেখানে দেখা যায় রাষ্ট্র ও কারাগার ব্যবস্থাপনায় যারা নিয়োজিত, তারা তাদের হাতে নিহত হওয়া কারাবন্দীদের হত্যার দায় এড়াতে নানা অবাস্তব কাহিনীর আশ্রয় নিয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রয়াত লেখক ক্রিস ভন উইক প্রশাসনের জালিয়াতি এবং গতানুগতিক মিথ্যা বর্ণনা নিয়ে বিদ্রুপ করেছেন এবং পোস্টমর্টেম রিপোর্টে উল্লেখ করা অপরাধীদের ওপর চালানো নিপীড়নের কথা তাঁর কবিতা *In Detention*-এ তুলে ধরেছেন :

He fell from the ninth floor
He hanged himself
He slipped on a piece of soap while washing
He fell from the ninth floor
He hanged himself while washing
He slipped from the ninth floor
He hung from the ninth floor
He slipped on the ninth floor while washing
He fell from a piece of soap while slipping
He hung from the ninth floor
He washed from the ninth floor while slipping
He hung from a piece of soap while washing.

এই পঙক্তিগুলো নিরাপত্তা পুলিশের হাতে নিহত হওয়া অসংখ্য রাজনৈতিক বন্দী, বিশেষ করে মুসলিম ধর্মীয় নেতা ইমাম হারুন আব্দুল্লাহর মৃত্যুর ব্যাপারটি বর্ণনা করে। তাঁকে কেপটাউনের জেলে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে আটক করার পর হত্যা করা হয়, অথচ কারণ দর্শানো হয় যে তিনি গোসল করার সময় সাবানে পা পিছলে পড়ে মারা গেছেন!

অত্যাচারিতদের ন্যায়বিচার এবং স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার কারণে মুসলিমদের অনতিক্রম্য কষ্টের সাগর পাড়ি দিতে হয়েছে। এখানে একটি সত্য প্রকাশ পায়—ব্রাইটন, ইরাকি, আফগান, মিসরীয়, কাশ্মীরি, ফিলিস্তিনি, উইঘুরি এবং একই নীতি সম্পন্ন লোকেরা

একই অবস্থায় রয়েছে, কারণ তাদের সকলকেই ন্যায়নীতিহীন রাষ্ট্রসমূহ নিজেদের শত্রু ভাবে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় জাতিগত বিভেদ শেষ হওয়ার কিছুদিন পরই আবার একে War on Terror বা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-এর সাথে জড়িয়ে ফেলা হয়। CIA তাদের অপহরণ, অত্যাচার এবং গুম করে দেওয়ার মতো ঘটনাগুলোকে ধামাচাপা দিতে সারা পৃথিবীতে জালের মতো গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক ছড়িয়ে রেখেছে। দমন-পীড়ন থেকে বের হয়ে এসে উন্নয়নশীল গণতন্ত্রে পদার্পণের সময় দক্ষিণ আফ্রিকা অত্যাচার, অন্যান্য নিষ্ঠুরতা, অমানুষিকতা অথবা বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে জাতিসংঘের কনভেনশনে স্বাক্ষর করে, তবু ২০০৩ সালে দেশ থেকে গুম হওয়া সাউদ মেমোন-এর নাম CIA কর্তৃক বন্দীদশায় নিপীড়নের শিকার হওয়া ১০০ জনের তালিকায় পাওয়া গেছে।

এটা পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করে যে, মেমোনের অপহরণের কাজে দক্ষিণ আফ্রিকার গোয়েন্দা সংস্থা, পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা এবং আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা একত্রে কাজ করেছে। অভিযোগ করা হয়, যে খামার ঘরে সাংবাদিক ড্যানিয়েল পার্ল-এর লাশ পাওয়া গিয়েছিল তা মেমোনের মালিকানাধীন। এই ঘটনার পর তিনি সাউথ আফ্রিকায় চলে আসেন এবং ২০০৩ সালের মার্চ মাসে FBI তাঁকে ধরে নিয়ে যায়। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে তাঁর গায়েব হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা অনেকদিন পর্যন্ত রহস্যে ঘেরা ছিল। তিনি কি দক্ষিণ আফ্রিকারই দুটি ব্ল্যাক সাইটের কোনো একটিতে বন্দী ছিলেন, নাকি তাঁকে আমেরিকান গোয়েন্দা বাহিনীর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

টর্চার রিপোর্ট থেকে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, ২০০৭ সালের আগ পর্যন্ত তিনি গুয়ান্তানামো বে কারাগারে বন্দী ছিলেন। সেখানে তাঁকে অভুক্ত রাখা হয়, অত্যাচার করা হয়। তাঁর ওজন কমে ৩৫ কেজিতে নেমে আসে। ঐ অবস্থায় মেমোন কথা বলতে পারতেন না, পরিবারের সদস্যদেরও চিনতে পারতেন না। পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থা ISI তাঁকে তাঁর বাড়ির সামনে ফেলে যাওয়ার ২০ দিনের মধ্যেই তিনি মারা যান। ড্যানিয়েল পার্লের হত্যাকাণ্ডের সাথে তাঁর সম্পৃক্ততার কোনো প্রমাণ এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এমনকি

হত্যার সাথে অভিযুক্ততার প্রেক্ষিতেও তাঁর বিরুদ্ধে কখনো চার্জশিট দাখিল বা তাঁকে বিচারের অধীনে আনার কাজটিও হয়নি।

সাউদ মেমোনের হত্যায় দক্ষিণ আফ্রিকার ভূমিকা বরাবরই প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়। বর্বর উপনিবেশিক সরকারের হাতে নিজেরা বছরের পর বছর নিপীড়নের শিকার হওয়া এবং তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও আন্দোলন করার পর নিজেরাই কীভাবে 'ট্রুথ এন্ড রিকন্সিলিয়েশন কমিশন' কর্তৃক আনিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগকে বিচারের আওতায় না এনে উল্টো নিজেদের কাজকে সমর্থন করে? কীভাবে নব-প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণ আফ্রিকা নিজের নৈতিকতা ও দায়িত্ববোধ অস্বীকার করে? কেমন করে তারা শুধু চাপের কারণে একজন বিদেশী নাগরিককে হত্যা করতে পারে?

২০১৫ সালে আলজাজিরায় প্রচারিত এক ডকুমেন্টারিতে দক্ষিণ আফ্রিকায় বিভিন্ন দেশ কর্তৃক সৃষ্ট গোয়েন্দা-জালের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে, যেখানে দেখা যায় দেশটি আমেরিকান ও ইসরায়েলী গোয়েন্দা সংস্থার গোপন তৎপরতার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে।

War on Terror-এর দুরাচার সম্পর্কে বলতে গিয়ে অস্ট্রেলিয়ান সাংবাদিক জন পিলগার একে War for Terror হিসেবে অভিহিত করেছেন। কারণ, এখন পৃথিবীর যেকোনো দেশের ওপর যেকোনো সময়ে 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ'-এর নাম দিয়ে বিনা বাধায় বলপ্রয়োগের সুযোগ আমেরিকা ও তার মিত্রদের আছে। যার কারণে যেসব দেশই পশ্চিমাদের বিরোধিতা করার চেষ্টা করেছে তাদের ওপরই পশ্চিমারা কাল্পনিক 'ভয়াবহ যুদ্ধ করার মানসিকতা' চাপিয়ে দেওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে নিজেদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করিয়ে নিয়েছে। নিজেদের দেশ কিংবা অন্য দেশে বসবাসরত নাগরিকদের চিহ্নিত করে গুপ্তভাবে হত্যা করছে। এছাড়া বিভিন্ন দেশে সাম্রাজ্যবাদী এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী সরকারকে অর্থায়নের মাধ্যমে ক্ষমতায় আনা, নিরীহ ও নিরস্ত্র মানুষদের গণহারে ড্রোন আক্রমণে হত্যা করা এগুলো তাদের নৈমিত্তিক কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ থেকেই বোঝা যায়, 'ভয়ানক সন্ত্রাসী' বা 'ইসলামিস্ট'দের সমূলে উৎপাটন করার প্রোপাগান্ডা চালিয়ে জুলুম ও হিংস্রতাকে তাদের দেশে বৈধতা দিয়েছে। এরকম কাজের ব্যাপারেই জর্জ অরওয়েল একটি সূত্রের কথা বলেছিলেন-

সত্যকে প্রভাবিত করার সূত্র। এই সূত্র ধরে ক্ষমতাবানরা প্রথমে জনগণকে মিথ্যা তথ্য দেয়। এরপর তাদের মনে কোনো একটি আদর্শ (যেমন ইসলাম)-এর বিরুদ্ধে বিদ্বেষের বীজ বপন করে। পরে ধীরে ধীরে নিজেদের যেকোনো কাজকে জনগণের কাছে বৈধ করে তোলে।

এই পর্যায়ে এসে একটি ব্যাপার মনে করিয়ে দেওয়া জরুরি, পৃথিবী জুড়ে অসংখ্য ভুক্তভোগী এসব বিভ্রান্তিকর ও গোপন কারাগারে বন্দী অবস্থায় আছেন। এমনকি বিভিন্ন মুসলিম দেশেও এমন গোপন জেলখানার অস্তিত্ব পাওয়া যাবে, যেখানে ভুক্তভোগীদের কয়েদ করে রাখা হয় আর চালানো হয় অমানুষিক নির্যাতন। ফিলিস্তিনের দখলদাররা তো শিশুদেরও আটক করে এবং তাদের ওপর অত্যাচার চালায়। তারা এমন অসংখ্য মানুষকে বন্দী করে রেখেছে যারা ফিলিস্তিনের প্রকৃত বাসিন্দা এবং দখলদারদের দ্বারা বিতাড়িত ব্যক্তিদের বংশধর। মারওয়ান বারগুতিও এমন একজন যাঁকে জায়নিস্টরা শেকল দিয়ে বেঁধে রেখেছিল, কিন্তু দমাতে পারেনি এতটুকুও। তিনি সবসময়ই তাদের বিরুদ্ধে ছিলেন অবিচল।

২০০২ সাল থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ৭৭৯ জন মানুষকে ধরে নিয়ে গুয়ান্তানামো বে কারাগারে বন্দী করে রাখা হয়েছে। এদের মধ্যে ১২২ জন এখনও তাদের জিম্মায় আছেন[২]। ব্রিটিশ নাগরিক শাকের আমেরকে ১৪ই ফেব্রুয়ারি ২০০২ তারিখে গুয়ান্তানামোতে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রায় ১৩ বছর যাবৎ কোনোরকম চার্জশিট দাখিল বা বিচারের মুখোমুখি করা ছাড়াই তাঁকে সেখানে আটকে রাখা হয়েছে। এখনও তিনি মুক্তির আশায় প্রতিটা দিন পার করছেন[৩]। তাঁর সাথে অবস্থানকারী কয়েদীদের মতো তাঁকেও ভয়ানক অত্যাচার, নিপীড়ন এবং নিষ্ঠুর জিজ্ঞাসাবাদের শিকার হতে হয়েছে। ইতোমধ্যে মুক্তির ঘোষণা দেওয়া হলেও এখনো তিনি নরকসম কারাগারে প্রায় ধ্বংস হয়ে যাওয়া শরীর এবং হৃদয় নিয়ে আটক রয়েছেন।

---

২. বইটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশ হওয়ার সময় পর্যন্ত ৪১ জন এখনো বন্দী আছেন।

৩. শাকের আমের ২০১৫ সালে মুক্তি লাভ করেন। মোয়াজ্জেম বেগের বই 'এনিমি কমব্যাটান্ট' শাকের আমের সম্পর্কে আরো বর্ণনা পাওয়া যাবে।

নিশ্চয় যারা মুমিন পুরুষ ও নারীদের ওপর জুলুম-পীড়ন
চালায়, অতঃপর তাওবা করে না, তাদের জন্য রয়েছে
জাহান্নামের শাস্তি আর আগুনে দগ্ধ হওয়ার যন্ত্রণা।
(সূরা বুরুজ, ৮৫ : ১০)

শেখ আবদুস সালামের এই গা ছমছমে স্মৃতিচারণমূলক বইটিতেও আমেরিকান সৈন্যদের দ্বারা গুয়ান্তানামো বে এবং পৃথিবীব্যাপী তাদের বিভিন্ন কারাগারে বন্দীদের ওপর চালানো নিষ্ঠুর এবং বর্বর অত্যাচারের কথা তুলে ধরা হয়েছে। নিজে ভোগান্তির শিকার হওয়া, অন্যদের ভোগান্তি দেখা, গালিগালাজ এবং নাকাল অবস্থা সহ্য করার যৌথ চিত্র উঠে এসেছে এই বইয়ে। অন্যদিকে বন্দীদের সাহসিকতা, আশা এবং ইস্পাত কঠিন সংকল্প অত্যাচারের মুখে মারা না যাওয়া এবং তাঁদের মনে অত্যাচারীর ঢেলে দেওয়া বিষ যেন ঢুকে না যায়, তার জন্য গভীর প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের প্রমাণ পাওয়া যায়। যেটাকে দক্ষিণ আফ্রিকানদের তিক্ত স্মৃতির সাথে তুলনা করা যায়—যার ক্ষত এখনও শুকায়নি।

জুলেখা আদম দিনাত
জোহানসবার্গ
ফেব্রুয়ারি, ২০১৫

লেখকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সমস্ত প্রশংসা সারা বিশ্বের মালিক আল্লাহর জন্য। দরূদ ও সালাম রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি। শান্তি বর্ষিত হোক বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের (রা.) ওপরও।

বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে নীচ, নিষ্ঠুর এবং নিকৃষ্ট ক্ষমতাধরের কারাগার থেকে আমাকে মুক্ত করে আনার জন্য আমি আল্লাহর প্রতি বিনম্র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সেসব বন্ধুকেও জানাই অশেষ ধন্যবাদ যারা গুয়ান্তানামো বে কারাগার থেকে আমাকে ছাড়িয়ে আনার জন্য সম্ভাব্য এবং সম্ভব সবকিছুই করেছে। এমন এক দুনিয়ায় আমরা এখন আছি যেখানে নিরপরাধ লোককে সন্ত্রাসী বলে গালি দেওয়া হয়। তাদের আটক করা হয় নিয়মিত।

আন্তর্জাতিক আইনের বিরুদ্ধে গিয়ে বিভিন্ন দেশের সংবিধানকে পাশ কাটিয়ে যুক্তরাষ্ট্র এখনও গুয়ান্তানামো বে কারাগার পরিচালনা করে যাচ্ছে। জাতিসংঘের হিউম্যান রাইটস কমিশনসহ অন্যান্য অনেক মানবাধিকার সংগঠনের নিষেধাজ্ঞা এবং একের পর এক নিন্দাজ্ঞাপন সত্ত্বেও আমেরিকা এই জঘন্য কারাগারটি বন্ধ করেনি।

নব্য সাম্রাজ্যবাদী এই শক্তি কোনো আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন মানে না। এ কারণে তাদেরকেই তো বরং সন্ত্রাসী বলা যায়।

পাকিস্তানী সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টদের সহায়তা নিয়ে এই ভয়ঙ্কর দানব আমাকে গ্রেফতার করেছিল। অতঃপর পাঠিয়ে দেওয়া হয় কিউবায়। কোনোরকম অভিযোগ ছাড়াই দুই বছর দশ মাস বন্দী ছিলাম আমি। এরপর আমাকে হস্তান্তর করা হয় আফগানিস্তান সরকারের কাছে।

মুক্তি পাওয়ার পর থেকেই পরিচিত ভাইয়েরা আমার কান ঝালাপালা করে দিয়েছে গুয়ান্তানামো বে কারাগারের অভিজ্ঞতা নিয়ে দুকলম লেখার জন্য। সেই উস্কানিতেই এই বই লেখা শুরু। ঠিক করেছিলাম একেবারে সহজ ভাষায় পুরো গল্পটা বলে যাব। যেন আমার জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়া সেই তিনটি বছরে কী কী ঘটেছিল তা সবাই সহজে বুঝতে পারে।

সেসময়ের অভিজ্ঞতার ঝাঁপি থেকে কেবল যেগুলোর কথা স্পষ্টভাবে মনে আছে সেগুলোই লেখার চেষ্টা করেছি। আমার বিশ্বাস, এই গল্পগুলো আমার সম্পর্কে যে কারও যেকোনো প্রশ্নের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে।

একে তো ইংরেজি আমার ভাষা না, তার ওপর এমন কঠিন সময় নিয়ে লিখে যাওয়া খুব একটা সহজ ছিল না। তাছাড়া জেলের জীবন একজন মানুষের মগজে খুবই যন্ত্রণাময় কিছু স্মৃতির ছাপ রেখে যায়। তার মনে সৃষ্টি হয় গভীর কিছু ক্ষত। যেগুলোর ফলে ওসব নিয়ে লেখা আরও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

এখানে যা যা লিখেছি তার কিছু অংশ পাঠকের কাছে অস্বস্তিকর লাগতে পারে। বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় আমাদের সাবধান হওয়াই উচিত। কিছু সমালোচক অবশ্য বলেছেন বইতে আমার গল্প প্রকাশের মাধ্যমে আমি নিজেকে এবং অন্য অনেককে বিপদের মুখে ফেলে দিতে পারি।

কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, এসব প্রতারক ষড়যন্ত্রী এবং গোপন চুক্তির মাধ্যমে যারা আমাদের মানবতাকে লুট করে নিয়ে যায়, তাদের ভয়ে ভীত হওয়া মুসলিমদের কাজ না। মানবাধিকার রক্ষার নামে ওরা আমাদের সাথে পশুর মতো আচরণ করে। এতকিছুর পরও আমাদের নীরবতা এক অর্থে ওদেরকে আমাদের সমাজ, আমাদের জীবন ধ্বংসের অনুমতিই দিয়ে দেয়।

এসব দুমুখো সাপদের চেহারা চেনে নেওয়া মুসলিমদের দায়িত্ব। এরা আমাদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য অন্তরে বিষ রেখে মুখে মধু নিয়ে হাজির হয়।

কিছু কঠিন সত্য এবং আমার কিছু ক্রোধের কারণ আপনারা খুব সহজে হয়তো মেনে নিতে পারবেন না। আমার কিছু কথা পক্ষপাতী মনে হতে পারে। কিন্তু আল্লাহর কসম করে বলছি, কারও প্রতি কোনোরকম বৈষম্য বা কারও ব্যাপারে কোনোপ্রকার রায় দিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে আমার ছিল না।

আমি কেবল আল্লাহর প্রতিই নিজেকে সঁপে দিয়েছি। সমাজে আমাদের প্রত্যেকেরই আলাদা অবস্থান এবং দায়দায়িত্ব আছে। এখানে কিছু দেশকে দোষারোপ করেছি, সমালোচনা করেছি তাদের দ্বিমুখী আচরণের কারণে; আইনকে ইচ্ছেমতো ব্যবহার করার কারণে। আর এ দোষারোপ বা সমালোচনা কোনোভাবেই জনগণের প্রতি না বরং সম্পূর্ণভাবে তাদের সরকারের প্রতি।

আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই সেসমস্ত মুসলিম ভাইবোনকে যাঁরা আমার দেশে আমেরিকা-রাশিয়ার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। আল্লাহ আমাদের অতীত এবং বর্তমানের দুঃসময় থেকে রক্ষা করুন। আফগানিস্তানসহ সারা বিশ্বে শয়তানী ধ্যান-ধারণা ছড়িয়ে পড়া থেকে আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন।

আল্লাহর ক্ষমার দ্বার উন্মোচিত হোক আমাদের জন্য।

আবদুস সালাম জাইফ

অদ্ভুত স্বপ্ন

গ্রেফতার হওয়ার কিছুদিন আগে আমার বড় ভাইকে স্বপ্নে দেখি। তার হাতে বড় এক ছুরি ধরা। একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তার জামার হাতা ছিল গোটানো আর ছুরিটা মাথার ওপর ঘোরাতে ঘোরাতে আমার দিকে এগিয়ে আসছিল। কাছে এসে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে মৃদুস্বরে বলল, "ভাই, তোকে তো এখন আমি জবাই করব।"

আমার নিজের ভাই এমন জঘন্য কাজ করতে পারে, ব্যাপারটা বিশ্বাসই হচ্ছিল না। আমি তো তার সাথে কখনোই বেয়াদবি করিনি, তাকে কষ্টও দিইনি। প্রথমে ভেবেছিলাম সে মজা করছে বা তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু তার জেদ দেখে বুঝলাম সে আসলেই আমাকে খুন করতে এসেছে।

তো ভাবলাম, আমার গলা কাটতে যদি তার ভালোই লাগে তাহলে কাটুক। স্বপ্নের মাঝেই আমার মনে হলো, যদি কথা দিয়ে বুঝিয়ে তাকে নিবৃত্ত করতে না পারি তাহলে তাকে বাধা দেওয়াও উচিত হবে না। তাই আমি নম্রভাবে বললাম, "আমি তো কখনো কোনো অন্যায় কিছু করিনি, কখনো কারও ক্ষতিও করিনি, তাহলে কিসের প্রতিশোধ নিতে চাইছ তুমি? কেন আমাকে জবাই করতে চাইছ?" কিন্তু কোনো লাভ হলো না। আমার ভাই আরও কাছে আসতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত আমি প্রস্তুত করলাম তার ছুরির নিচে নিজেকে পেতে দেওয়ার জন্য। ভেবেছিলাম তর্ক না করলে সে থেমে যাবে। তাই শুয়ে পড়লাম এবং চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু আমার ভাই ক্ষিপ্ত হয়ে ক্ষিপ্রতার সাথে একজন কসাইয়ের মতো আমার গলার ওপর ছুরিটা রাখল এবং দ্রুত এক পোঁচ দিয়ে আমার মাথা আলাদা করে দিলো।

স্বপ্নটা দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেও কারো কাছে বলিনি। আমি জানতাম না এর অর্থ কীভাবে বের করতে পারি। এর পাঁচ কি ছয়দিন পর পাকিস্তানী বাহিনী আমার বাড়ি ঘিরে ফেলে।

অনধিকারপ্রবেশ

২০০২ সালের জানুয়ারির প্রথম দিনটি পাকিস্তানের সরকারী কর্মজীবীরা নববর্ষ উদযাপন করে কাটিয়েছিল। দুর্ভাগ্যে ভরা সেই বছরের দ্বিতীয় দিন আমি পাকিস্তানে নিযুক্ত আফগান রাষ্ট্রদূতের নিয়মিত দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছিলাম। সেসব নিয়মিত দায়িত্বের মধ্যে ছিল বন্দী, নিহত কিংবা নিখোঁজ ব্যক্তিদের খুঁজে বের করা। এই ভাইদের ধরে এনেছিল আফগানিস্তানে আমেরিকার সেনাপতি আবদুর রশীদ দস্তম। এই লোক আবার এখন ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়েছে। ২০০২ সালে সে উত্তর আফগানিস্তানে ব্যাপক তাণ্ডব চালাচ্ছিল আর আমি চেষ্টা করছিলাম সেখানকার মানুষগুলোকে নিরাপদে সরিয়ে আনতে।

তখন আমি তাদের নিরাপত্তার কথাই ভাবছিলাম শুধু। নিজের কথা একবারও চিন্তা করিনি। কখনো মনে হয়নি আমি আমার জীবনের সবচেয়ে বড় দুর্যোগের মুখোমুখি হতে যাচ্ছি। বুঝতেই পারিনি যে আমার পরিবারের চিরচেনা শান্তি স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে কোনো একদিন।

সেদিন রাত আটটায় দারোয়ান জানাল কয়েকজন পাকিস্তানী কর্মকর্তা আমার সাথে কথা বলতে চায়। আমি তাদের সাথে দেখা করতে ডাইনিং রুমে এলাম, এই রুম সাধারণত গুরুত্বপূর্ণ অতিথিদের জন্যই নির্ধারিত থাকত। তারা নিজেদের পরিচয় দিলো। মনে আছে 'গুলজার' নামে একজন পশতুন এসেছিল, আর তার সাথে ছিল উর্দুভাষী আরও দুইজন। আমি সালাম দিয়ে বিনীতভাবে তাদের স্বাগত জানিয়ে চা সাধলাম।

যখন তাদের একজন কথা বলে উঠল, আমি তার কণ্ঠে রাগ এবং চেহারায় আগুন দেখে চমকে গেলাম। লোকটার ছিল বিশাল ভুঁড়ি, মোটা ঠোঁট আর লম্বা নাক। আমার মনে প্রথম যে ধারণাটা এলো, তা হলো—এই লোকটা এইমাত্র জাহান্নাম থেকে বের হয়ে এসেছে নাকি? উঁচু গলায়, রাগতস্বরে সে বলল, "মাননীয়, আপনি আর মাননীয় নন!" সে বলে চলল যে, আমেরিকা এমন এক সুপারপাওয়ার যা নিয়ে কেউ কখনো প্রশ্ন করেনি। যাদেরকে কেউ কখনো চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেনি। সে আরও বলল,

আমেরিকা আমার ব্যাপারে তদন্ত করেছে। তারা আমার বাসায় এসেছে আমেরিকার এমন নির্দেশনায় যে, হয় পাকিস্তান আমাকে আমেরিকার হাতে তুলে দেবে নয়তো পাকিস্তানকে আমেরিকা দেখে নেবে।

আমি বললাম যে, আমি তাদের সাথে একমত। বললাম যে, হ্যাঁ আমেরিকা এক পরাশক্তি। কিন্তু আন্তর্জাতিক আইন এবং সংবিধানের কথাও আমাদের মাথায় রাখতে হবে। সম্মান জানাতে হবে দেশের সাথে দেশের কূটনৈতিক বোঝাপড়াকেও।

তাকে জিজ্ঞেস করলাম—যে আইন এখানে তারা প্রয়োগ করছে তা কি ইসলামিক নাকি অনৈসলামিক। বললাম কোনো আন্তর্জাতিক আইনই তাকে অধিকার দেয় না আমাকে গ্রেফতার করার। যদিও পাকিস্তানের ক্ষমতা আছে বড়জোর আমাকে তার ভূমি থেকে চলে যেতে বলার, কিন্তু এভাবে গ্রেফতার তারা কখনোই করতে পারে না।

"আমরা এই মুহূর্তে ইসলাম বা অন্যকোনো আইন মানতে চাচ্ছি না। এখন আমরা শুধু আমাদের লাভের দিকটাই দেখব।" এভাবেই জবাব দিয়েছিল লোকটা।

আমি শান্তস্বরে তাদের যা ইচ্ছা করতে বললাম। তাদের দেশ, তাদের স্বাধীনতা। মাঝরাত পর্যন্ত আমাকে ঘরেই থাকতে বলা হলো। এরপর আমাকে পেশাওয়ার নিয়ে যাওয়া হবে। আমাকে বলা হলো রাষ্ট্রদূত হিসেবে যে বাড়িতে আমি আছি সেটা সেনাবাহিনীর হাতে সোপর্দ করা হবে এবং এই বাড়ির প্রাঙ্গণ পেরুনোর কোনো উপায়ই আমার ছিল না।

গ্রেফতার হওয়ার মুহূর্তেও আমার পাকিস্তানে থাকার জন্য দশ মাসের ভিসা ছিল। তাছাড়া আফগানিস্তানের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার আগ পর্যন্ত আমার অবস্থানকে সরকারী স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য পাকিস্তান সরকারে কাছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় চিঠিও পাঠিয়েছিল। এমনকি জাতিসংঘ থেকে পাঠানো এক চিঠিতে আমার কোনো ক্ষতি না করার এবং একজন সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে সার্বিক নিরাপত্তা দেওয়ার নির্দেশনাও ছিল। এসব কূটনৈতিক নিরাপত্তা পাওয়ার দলীল হিসেবে বিবেচ্য হতে পারত।

কিন্তু এসবের কোনোকিছুই তোয়াক্কা না করে আমাকে গ্রেফতার করা হয়।

সমর্পণ

আমাকে বলা হয়েছিল যে পেশাওয়ার নিয়ে যাওয়া হবে যেখানে আমেরিকানরা আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। দশদিনের প্রশ্নোত্তর শেষে আমাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। তারপর আমি বাড়ি ফিরে যেতে পারব।

আমার বাড়ির সামনে যখন তিনটি গাড়ি এসে থামে, তখন প্রায় মাঝরাত। পাকিস্তানী নিরাপত্তাবাহিনী আমার বাড়ির দিকে আসা সমস্ত পথ বন্ধ করে দিয়েছিল। যেসব সাংবাদিক ঘটনাটা সম্প্রচার করতে বা আমার সাক্ষাৎকার নিতে চেয়েছে, তাদেরকেও আসতে দেওয়া হয়নি। এতই জঘন্য ছিল এই অভিযান যে, ব্যাপারটা মাঝরাত্রে এসে ঘটাতে হয়েছে। মোটের ওপর তারা তো আসলে একজন রাষ্ট্রদূতকে গোপনে অপহরণই করেছে। বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার সময় আমি আমার বাচ্চাদের দিশেহারা কান্না শুনতে পাচ্ছিলাম। তাদের সেই রাতের চাপা কান্না আমাকে আজীবন তাড়িয়ে বেড়াবে।

এটা সত্যি—আমার সন্তানদের ছেড়ে যেতে আমার কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু তারচেয়েও বেশি কষ্ট পেয়েছিলাম আমি পাকিস্তানী সৈন্যদের আচরণ দেখে। অথচ এদেরকে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে ইসলামকে রক্ষার জন্য। নিরীহ মুসলিমদের প্রতি তাদের নিষ্ঠুরতা ছিল লজ্জাজনক। তাদের সব কাজই ছিল কুরআনের শিক্ষার বিরোধী। নিজেকে জিজ্ঞেস করতে আমি বাধ্য হয়েছিলাম—তারা কি ইসলামের সৌন্দর্য ত্যাগ করেছে কাফেরদের খুশি রেখে কেবল কিছু পয়সা কামানোর জন্য?

যখন আমাকে বাড়ির বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, আমার কেমন ভয় ভয় করছিল। ভেবে পাচ্ছিলাম না কেন কেউ এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করছিল না; কেন কেউ আমার পাশে দাঁড়াচ্ছিল না। পাকিস্তান সরকার যে তাদের ঈমান এবং জিহাদ নিয়ে কথাগুলো বলার পর আবার এতটা শঠতাপূর্ণ আচরণ করতে পারে তা আমি ভাবতেও পারিনি।

যে গাড়িতে নিয়ে আমাকে তোলা হয়েছিল তা খুবই বাজে আকৃতির ছিল। আমার সাথে ছিল নিরস্ত্র দুইজন ইন্টার সার্ভিস ইন্টেলিজেন্স (ISI) কর্মকর্তা। কিন্তু সামনে-পেছনের অন্য যে দুটো গাড়ি, সেগুলোতে ছিল প্রচুর অস্ত্রধারী লোকজন। আমাকে পেশাওয়ারে নিয়ে যাওয়ার সেই সারাটা পথ জুড়ে একটি টেপরেকর্ডারে অনবরত বেজে চলছিল এক মহিলার উর্দু গান। এবং তা শুধুই আমাকে বিরক্ত করার জন্য।

নামাজ পড়ার জন্য গাড়িটা কিছুক্ষণ থামাতে বলেছিলাম তাদের। কিন্তু তারা বলেছিল পেশাওয়ার পৌঁছার পর নামাজ পড়ার সুযোগ পাব।

পেশাওয়ারে এসে আমাকে একটি অফিসরুমে নিয়ে আসা হয়। কক্ষটি ছিল ছিমছাম ফার্নিচারে সাজানো-গোছানো। সামনের টেবিলে ছিল একটি পাকিস্তানের পতাকা, পেছনের দেয়ালে ঝুলছিল পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর ছবি। একজন পশতু অফিসার উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে স্বাগত জানাল। গড়পড়তা উচ্চতা আর শারীরিক গঠনের লোকটার ক্লিন শেইভড ও মাথায় টাক ছিল। সে হেঁটে রুমের প্রবেশমুখের কাছে এলো। নিজের পরিচয় দিয়ে জানাল সে এই কার্যালয়ের প্রধান। দেখে মনে হয়েছিল এটাই আইএসআই-এর প্রধান কার্যালয়। কাজেকর্মে যা শয়তানের কারখানা।

লোকটা আরও জানাল, আমি তাদের খুবই কাছের এমন একজন বন্ধু এবং অতিথি, যাকে তারা ভীষণ পছন্দ করে। আমি জানি না এর মানে কী ছিল। তবে যতটুকু বুঝেছিলাম-এসব বলে সে চাইছিল নিজের সততা প্রদর্শন করতে। যদিও ততক্ষণে আঁচ করতে পারছিলাম যে তারা আমাকে খুব উচ্চমূল্যে বিক্রি করে দেবে। এমনও মানুষ আছে যারা গরু-ছাগলের মতো মানুষ কেনাবেচা করে। একজন মানুষের দাম যত বেশি হয়, ব্যবসায়ীও তত খুশি হয়। আপনারা হয়তো বিশ্বাস করছেন না, তবে এই একুশ শতকে এসেও মানব পাচার এবং দাসপ্রথা পাকিস্তানে প্রচলিত আছে। এখানে মানুষ বেচাকেনার একটি মার্কেটও আছে।

সেই কর্মকর্তার সাথে চা আর রাতের খাবার খেলাম। তারপর নামাজ পড়লাম। নামাজ শেষে আমাকে একটি কক্ষ দেখানো হলো, যেখানে বন্দীদের রাখা হতো। রুমটি আকার আকৃতিতে বেশ ভালোই ছিল। গ্যাসের লাইন,

বিদ্যুৎ সুবিধা এবং টয়লেটও ছিল। সেখানে খাওয়া-দাওয়াতে আমার কোনো সমস্যা হয়নি। পড়ার জন্য এক কপি কুরআন, লেখার জন্য একটি কলম এবং একটি নোটবুক রাখা ছিল সেখানে। দরজার দারোয়ান লোকটাও ছিল যথেষ্ট আন্তরিক। সে রাতটা কাটানোর জন্য যা চেয়েছি, তা-ই জোগাড় করে দিয়েছিল।

এই সময়ের মধ্যে কোনোরূপ তদন্ত বা জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখিই হইনি। কিন্তু একজন লোক ছিল, যে প্রতিদিন আমাকে দেখতে আসত। সে পশতু ভাষা জানত না। উর্দুতে কথা বলত, যা আবার আমি বুঝতাম না। প্রতিদিন আমাকে জিজ্ঞেস করত, "কী হতে যাচ্ছে?" আর আমিও প্রতিদিন একই জবাব দিতাম, "একমাত্র আল্লাহই জানেন কী হবে।"

আমার কক্ষের ওদিকটায় যেসব কর্মচারী আসত তাদের বেশিরভাগই ছিল যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল। প্রতিবার তারা সালাম দিত। কেউ আমার সাথে কথা বলত না, কিন্তু আমার দিকে তাকালেই ওদের ছলছল চোখ আমি দেখতে পেতাম।

সবশেষে যে এসেছিল সে এসেই ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করেছিল। এত বেশি কান্না করছিল লোকটা যে কাঁদতে কাঁদতে সে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল এবং কিছুক্ষণ পর সে জ্ঞান হারায়। এরপর আর কেউ আমার সাথে দেখা করতে আসেনি। চার ঘণ্টা পর আমাকে তুলে দেওয়া হয় আমেরিকানদের হাতে।

পেশাওয়ারে আমি পরপর দুই রাত কাটিয়েছিলাম। তৃতীয় রাতে এগারোটার সময় হঠাৎ দরজা খুলে যায়। আমি তখন বিছানা গোছাচ্ছিলাম। শশ্রুমুণ্ডিত স্বাভাবিক উচ্চতার একজন প্রবেশ করে সালাম দিলো। কেমন আছি জানতে চেয়ে জিজ্ঞেস করল, কী হতে যাচ্ছে তা সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা আছে কি না। জবাব দিলাম, 'না।' আসলেও তো জানি না কিছু। সে বলল আমাকে শীঘ্রই 'কোথাও' নিয়ে যাওয়া হবে। তার আগে পাঁচ মিনিট সময় পাব বাথরুম সেরে অজু করে নেওয়ার জন্য। কথা না বাড়িয়ে অজু করার জন্য উঠে দাঁড়ালাম।

পাঁচ মিনিট পর কালো কাপড় এবং হাতকড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকজনের সামনে এনে আমাকে হাজির করানো হয়। হাতকড়া পরিয়ে

তারা আমার চোখ বেঁধে দেয় শক্ত করে। জীবনে এমন অভিজ্ঞতা এই প্রথম। আমাকে সার্চ করে পবিত্র কুরআন, একটি ডিজিটাল ডিকশনারি এবং কিছু টাকা বের করে নেয় পকেট থেকে।

তারপর আর কিছু না বলে ধাক্কা দিয়ে, লাথি মেরে আমাকে নিয়ে ওঠায় একটি গাড়িতে। গাড়িটা প্রায় এক ঘণ্টা ধরে চলতে থাকে এবং পার্ক করতেই একটি হেলিকপ্টারের শব্দ শুনতে পাই। মনে মনে বুঝে নিলাম এটা হয়তো কোনো বিমানবন্দর, যেখান থেকে আমাকে আমেরিকার হাতে তুলে দেওয়া হবে।

কে যেন আক্রমণ করে বসল আমাকে। হাত থেকে দামী ঘড়িটা খুব বাজে ভাবে খুলে নিল। গাড়িটা আরও এগিয়ে গেল হেলিকপ্টারের কাছে। দুজন লোক আমাকে সাহায্য করেছিল নেমে আসার ব্যাপারে। কানে কানে কে যেন ফিসফিস করে বলেছিল 'খোদা হাফেজ', যেন কোনো প্রমোদ ভ্রমণে যাচ্ছি। আতঙ্ক আমার পুরো শরীর ঘিরে ধরল।

এবার আমেরিকার হাতে

হঠাৎ দুপাশ থেকে কারা যেন আক্রমণ করে বসল। ব্যাপারটাকে হয়তো ড্রাগন এসে কাউকে আক্রমণ করার সাথে তুলনা দিতে পারব। কয়েকজন লোক একসাথে আমাকে লাথি মারছিল। চিৎকার করে ধমকাচ্ছিল। অথচ আমি কিছুই দেখতে পারছিলাম না। একসময় ছুরি দিয়ে আমার কাপড় কাটতে লাগল ওরা। এরপর আমার চোখের বাঁধন খুলে দিলো। দেখলাম একপাশে কয়েকজন পাকিস্তানী আর বিপরীত দিকে কয়েকজন আমেরিকান দাঁড়িয়ে আছে। অনেকগুলো পাকিস্তানী মিলিটারি গাড়িও দেখলাম। একটার নম্বর প্লেট দেখে বুঝলাম ওটা কোনো এক জেনারেলের গাড়ি।

আমেরিকানরা আমাকে আঘাত করার সময় পাকিস্তানী লোকগুলো কেবল তাকিয়ে দেখছিল। সব কাপড় ছিঁড়ে তারা আমাকে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় দাঁড় করিয়ে রাখল। পবিত্র ইসলামের ওইসব তথাকথিত রক্ষাকারীরা নির্লজ্জের মতো তাকিয়ে ছিল আমার দিকে। একটা শব্দও তারা উচ্চারণ করেনি। মিলিটারি কায়দায় স্যালুট ঠুকে দাঁড়িয়ে ছিল ওরা, যেন আমাকে আমেরিকার হাতে তুলে দেওয়া উপলক্ষে উৎসব চলছিল সেখানে।

এই লজ্জা এবং অপমান আমাকে আজীবন বয়ে বেড়াতে হবে। এমন ভয়াবহ, অমানবিক আচরণের পেছনে কী যুক্তি থাকতে পারে কারও? তার ওপর যেখানে আমি ছিলাম সম্পূর্ণ নির্দোষ! পাকিস্তান যদি আমাকে আমেরিকার কাছে তুলে দিতে বাধ্য হতো তাহলে না হয় ব্যাপারটা মেনে নিতাম। তাছাড়া আমার সঙ্গে যেন কিছুটা হলেও সম্মান বজায় রেখে আচরণ করা হয়, নিদেনপক্ষে এটুকু দাবি তো করতে পারত। এতটুকু তারা করতেই পারত, যেহেতু আমি তাদের সার্বভৌম ভূমিতে ছিলাম তখনও। অথচ তারা টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করেনি।

নগ্ন অবস্থায়ই আমেরিকান সৈন্যরা আমাকে ঠেলে হেলিকপ্টারে নিয়ে ওঠায়। আমার হাত-পা বাঁধা হয়েছিল শক্ত করে। চোখ আবারও ঢেকে দিয়েছিল। এরপর একটি কালো ব্যাগ দিয়ে আমার মাথা, মুখমণ্ডলের চারপাশ

ঢেকে আটকে দেওয়া হয় ঘাড়ের সাথে। এমন আঁটসাঁট অবস্থায় আমাকে শুইয়ে বেঁধে দেওয়া হয় হেলিকপ্টারের ধাতব মেঝের সাথে।

না পারছিলাম সামান্য নড়তে, না পারছিলাম ঠিকভাবে শ্বাস নিতে। নড়াচড়া তো প্রায় অসম্ভব ছিল। যখনই একটু ভালো করে শ্বাস নেওয়া বা সামান্য নড়ার চেষ্টা করেছি, তখনই লাথি খেতে হয়েছে। ধীরে ধীরে অসাড় হয়ে পড়লাম। সমস্ত ভয় যেন কেটে গেল নিমিষেই। নিজেকে বুঝ দিলাম- শীঘ্রই এই বিভীষিকার অবসান হবে। মুক্তি নিয়ে হাজির হতে যাচ্ছে মৃত্যু।

জানি না ঠিক কতক্ষণ সেই অসহ্য চেঁচামেচি আর অত্যাচার চলেছিল। আল্লাহই ভালো বলতে পারবেন সেই যাত্রাপথটা কী করে আমি সহ্য করেছি। হেলিকপ্টারটা নেমে আসার পর ভেবেছিলাম ব্যথার সময় শেষ হয়ে এসেছে। কিন্তু আবারও আমাকে টেনে-হিঁচড়ে নামানো হলো, আরও কতগুলো মানুষরূপী পশু এসে লাথি মারতে শুরু করল।

একঘণ্টারও বেশি সময় ধরে আমাকে ফুটবলের মতো লাথি মারা চলছিল। এরপর ক্লান্ত হয়ে পড়লে সবাই মিলে আমার ওপর বসে পড়ল, যেন আমি একটা লম্বা বেঞ্চ। তাদের চোখে আমি ছিলাম কোনো এক জড়বস্তু। আর আমি তখন অপেক্ষা করছিলাম জীবন বিনাশী মৃত্যুর জন্য।

সম্ভবত দ্বিতীয় হেলিকপ্টারে ওঠানোর দুই কি তিন ঘণ্টা আগের ঘটনা এটা। এবার আমাকে শক্ত করে একটা লোহার চেয়ারে বাঁধা হয়। এই দফায় নির্যাতন থেকে সামান্য অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল। পঁচিশ মিনিট পর হেলিকপ্টারটি ল্যান্ড হলে আমাকে আবারও হিঁচড়ে নামানো হয়। এরপর টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয় অনেক দূরে। কানে এলো মানুষের শব্দ, অনেক মানুষ। এরপর আমাকে দাঁড় করিয়ে একজন দোভাষীর মাধ্যমে বলা হয় নিচে নামতে। থেমে থেমে নিচে নামতে লাগলাম। গুনে দেখেছিলাম ছয়তলা নিচে নেমে এসেছি। এরপর মাথা থেকে কালো ব্যাগটা খুলে নেওয়া হয়। খুলে দেওয়া হয় চোখ ও হাত।

চোখে আলো সয়ে এলে দেখলাম চারপাশে বহু আমেরিকান সৈন্য দাঁড়িয়ে আছে। ভয়ে আত্মা শুকিয়ে গেল যখন কয়েকজন কারাবন্দীকে দেখলাম।

একটা ছোট গোসলখানায় নিয়ে যাওয়া হলো আমাকে। কিন্তু কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাড়াতে না পারায় গোসল করাটা সেদিন ভয়ানক কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই পানির নিচে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলাম। একরকম নির্দিষ্ট পোশাক পরিয়ে আমাকে নিয়ে ঢোকানো হলো খাঁচার মতো ছোট একটি রুমে। এক মিটার উঁচু আর দুই মিটার লম্বা ছিল সেই রুমটি। সেখানে একটি টয়লেট আর একটি ট্যাপ ছিল। রুমের চারপাশ ছিল তারের জালিতে ঘেরা। কোনো বোর্ড বা দেয়াল না, শুধুই জালি। ওরা আমাকে বলল ঘুমিয়ে পড়তে।

নিজের অবস্থা নিজেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। ভাবছিলাম, এটা কি কোনো স্বপ্ন? চোখের পলকে সবকিছুই ঘটে গেল এবং আমি জানি না, কেন এমনটি ঘটল!

যুদ্ধজাহাজ

আমাকে যে খাঁচায় আটকে রাখা হয়েছিল তার পাহারায় ছিল একজন সৈন্য। সেখান থেকে তেরপালে ঢাকা আরও তিনটি খাঁচা দেখতে পাচ্ছিলাম। আর তখনই বুঝেছি যে আমি একটা জাহাজে আছি। আফগান যুদ্ধে আমেরিকার ব্যবহার করা বড় এক যুদ্ধজাহাজ। জাহাজের ছয় তলার নিচে আমাকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। সারাদিন রাত জুড়ে ইঞ্জিনের শব্দ শুনতে পেতাম। বিশ্বাস করতে কষ্ট হতো যে আমি আমেরিকার এক যুদ্ধজাহাজের গভীরে আটক আছি। ভয়ে কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলতাম। শুকিয়ে জিভ আটকে থাকত মুখের মাঝে।

আমার বামপাশে কয়েকজন বন্দী ছিলেন। যদিও আমরা পরস্পরকে দেখতে পাচ্ছিলাম, চিনতে পারিনি কেউ কাউকে। সকালের খাবার দেওয়া হলে সবাই একসাথে দাঁড়ালাম। যেভাবেই হোক, একসময় বুঝতে পেরেছিলাম মোল্লা ফজল নূরী, আবদুজ জাকির বুরহান, ওয়াসিক সাহেব এবং রুহানি এঁরা সবাই ছিলেন সেখানে। কিন্তু নিজেদের এমন অসহায় অবস্থায় মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকার বাইরে গিয়ে কোনো কথা বলা হয়ে ওঠেনি তখন।

সেদিন সকালেই একজন সৈন্য এসে আমাকে হাতকড়া পরিয়ে প্রশ্নোত্তরের জন্য ডেকে নিয়ে যায়। এত এত জিজ্ঞাসাবাদের মাঝে সেবারই প্রথম আমার হাত ও আঙুলের ছাপ নেওয়া হয়। সবদিক থেকে ছবি তোলে আমার। কারাকক্ষে ফিরিয়ে দেওয়ার আগে আমার বৃত্তান্ত লিখে নেয় ওরা। ফিরে এসে কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। কক্ষটিতে একটি কম্বল, প্লাস্টিকের চাদর, এক প্লেট ভাত আর সেদ্ধ ডিম রাখা ছিল। খাবারগুলো শেষ করে খালি প্লেটটি আমি সেনাসদস্যকে ফেরত দিয়েছিলাম।

শুয়ে একটু বিশ্রাম নিতে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু তখনই আবারও হাতকড়ার শব্দ শুনতে পেলাম। আরেক সৈন্য এসেছে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যেতে। এবার ওরা আমাকে শায়খ ওসামা বিন লাদেন এবং মোল্লা মোহাম্মদ ওমর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তাঁদের বর্তমান

অবস্থা এবং অবস্থান জিজ্ঞেস করল। জিজ্ঞেস করল তালিবানের কয়েকজন প্রধান ব্যক্তি কোথায় লুকিয়ে আছে বা তাঁদের কী হয়েছে সে সম্বন্ধেও। ৯/১১ নিয়ে খুব ছোট্ট একটা প্রশ্ন আমাকে করেছিল ওরা-আমি সেই ঘটনা সম্পর্কে আগে থেকে কিছু জানতাম কি না।

তখন বুঝতে পারলাম যে তারা জানত ঐ ঘটনার সাথে আমি কোনোভাবেই জড়িত না। কেউই জানে না সেদিন ঠিক কী ঘটেছিল, কে ঘটিয়েছিল। কিন্তু হাজার হাজার মানুষ এর কারণে কষ্ট ভোগ করেছে। হাজারও লোককে সন্দেহের তালিকায় ফেলা হয়েছে; গ্রেফতার, নির্যাতন এবং হত্যা করা হয়েছে। বিনাবিচারে আটক করে রাখা হয়েছে আরও বহু মানুষকে।

অযথা ভিত্তিহীন অভিযোগ এনে নির্দোষ ব্যক্তিদের সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে গেছে ওরা। চালিয়ে গেছে নির্যাতন। চার-পাঁচদিন যাবত আমাকেও ওসব ফালতু প্রশ্নে জর্জরিত করেছে। যদিও ভাগ্য ভালো, তখন কোনো হুমকি দেয়নি বা নির্যাতন করেনি।

ঐ আটকাবস্থা ছিল ভীষণ মানসিক চাপের। আর মৌলিক চাহিদাগুলো থেকে এভাবে বঞ্চিত করে রাখা তো খুবই অমানবিক। তবে সম্ভবত সবচেয়ে বাজে ছিল নিজের ভবিষ্যৎ কোনদিকে যাচ্ছে সে ব্যাপারে সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তায় থাকা।

বাগরাম

পাঁচ-ছয়দিন সেই জাহাজে থাকার পর এক সকালে আমাদেরকে ইউনিফর্ম পরতে দেওয়া হয়। প্লাস্টিকের তার দিয়ে আমাদের পরস্পরের হাত বাঁধা ছিল। আর মাথা-মুখমণ্ডলের চারদিকে ঘেরা সাদা ব্যাগ ছিল গলার সাথে আটকানো।

বন্দীদের মধ্যে সবশেষে আমাকে নামানো হয়। হাত-পা বাঁধা, মুখ ঢাকা অবস্থায়। ওখান থেকে বের করে আমাদের জাহাজের ডেকে নিয়ে আসা হয়। হামাগুড়ি দিয়ে আসতে হয়েছিল। ওপরে যে পাঁচজন আফগান ভাইয়ের নাম বলেছি, তাঁরা ছাড়াও আরও দুজন আরব এবং একজন আমেরিকান মুসলিমসহ আমাকে এনে দাঁড় করানো হয় এক জায়গায়। অন্যদের চেয়ে আমার পোশাক ছিল আলাদা। সবার ইউনিফর্ম নীল হলেও আমারটা ছিল ধূসর।

একটি হেলিকপ্টারে ওঠার জন্য আমরা কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করছিলাম। অনেক ভাই চিৎকার করে বলছিলেন যে তাঁরা শ্বাস নিতে পারছেন না। বলছিলেন এমন পজিশনে শুয়ে থাকার কারণে তাঁদের এত বেশি ব্যথা লাগছে যে, এই ব্যথায়ই তাঁরা মারা যাবেন। কেউ আমাদের কথা শোনেনি। তৃষ্ণায় শুকিয়ে যাওয়া গলা ভিজিয়ে দেওয়ার জন্য কাউকে এগিয়ে আসতে দেখিনি। শুধু শুনেছি সৈন্যদের একটাই চিৎকার–'চুপ থাক!'

আপাদমস্তক বাঁধা থাকা অবস্থায় তিন ঘণ্টা কাটানোর পর আমাদেরকে একরকম টেনে হেলিকপ্টারে তোলা হলো। প্রত্যেকেই কপ্টারের মেঝের সাথে বাঁধা হয়। পঁচিশ মিনিট পর কোনো এক অজানা স্থানে এসে কপ্টারটি থামে। যখন এক আমেরিকান সৈন্য এসে মুখোশ খুলে আমার চেহারা দেখার পরপরই আবার আটকে দিলো, শুধু সেই এক মুহূর্তের জন্য আমি আমার ভাইদের এক পলক দেখতে পেয়েছিলাম। তাদের সবার আমার মতোই অবস্থা।

ঐ অবস্থায় ওরা আমাদের ফেলে রেখেছিল আরও প্রায় তিন ঘণ্টা। এসময় আমরা নামাজও পড়তে পারিনি। কারণ যতবারই নড়াচড়া করতে

চেয়েছি ততবারই ভীষণ জোরে লাথি জুটেছে গায়ে। এর মাঝে একাধিক হেলিকপ্টার নেমেছে, উঠেছে। আমরা পড়ে ছিলাম আগের মতোই।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার প্রাক্কালে আমাদের ঠিক কাছেই এসে এক হেলিকপ্টার নামে। তারপর বিমানে তোলার আগে সেদিন প্রথমবারের মতো আমাদের বাঁধন খুলে দেওয়া হয়। সেই বিমান যাত্রার সময় একবার আমার মনে হচ্ছিল যেন পুলসিরাত পাড়ি দিচ্ছি। জীবনে এত ভয়ঙ্কর সময় আর কখনো পার করিনি।

আমাদেরকে আধা-দাঁড়ানো আধা-কুঁজো অবস্থায় বেঁধে রাখা হয়েছিল। উরু এবং বুক সামনের দিকে এনে এমনভাবে বেঁধে রেখেছিল যার ফলে অসহ্য ব্যথা হচ্ছিল। যখনই শরীরের কোনো অংশ সামান্য নাড়াতে বা সঙ্গীদের ছুঁতে গিয়েছি তখনই কোনো এক সৈন্য লাথি মেরে আমাদের দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

কেউ যে ব্যথায় কাতরাবে সে উপায় ছিল না। কারও সাহায্য চেয়েও কোনো লাভ হতো না। কারণ আমাদের অনেকেই ইংরেজি জানত না। আবার ওদের সাথে কথা বলার মতো সাহসও হয়তো কারও হয়নি তখন।

প্লেনের ভেতরে বাতাস প্রায় ছিলই না বলা যায়। ফলে শ্বাস নিতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। কোনো ছোট্ট ছিদ্র দিয়েও যদি অল্প কিছু বাতাস ভেতরে আসতে পারত তাহলেও নিজেদের ভাগ্যবান বলতে পারতাম।

গন্তব্যে পৌঁছানোর আগে প্লেনটি দুই জায়গায় অবতরণ করেছিল। যার মধ্যে একবার আমাকে ঠেলে নামিয়ে মাটিতে দাঁড় করিয়ে দেয় কেউ। কোনো কোনো সৈন্য চিৎকার করে বলছিল, "এটাই বড় শিকার, বড় শিকার।"

একথা শোনার পর প্রত্যেকেই আমাকে জোরে জোরে লাথি মারতে শুরু করেছিল। কেউ হাত দিয়ে, কেউ রাইফেল দিয়ে। আমার কাপড় ছিঁড়ে গেলেও মাথার সেই ব্যাগ বা মুখোশ এবং হাত-পায়ের বাঁধন আগের মতোই শক্ত হয়ে আটকে রইল। একঘণ্টা যাবৎ ইচ্ছেমতো মারধরের পর আমাকে নগ্ন অবস্থায় জমে থাকা ঠাণ্ডা তুষারের ওপর ছুঁড়ে ফেলে ওরা। তখনও তুষারপাত অব্যাহত ছিল।

সৈন্যরা আমাকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করছিল। বাজে কথা বলছিল, অসভ্য গান গাইছিল। শুধু পুরুষ না, নারী সেনারাও ছিল সেখানে। আমেরিকা নিয়ে

গাওয়া ওদের গানের একটা লাইন আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে। একই লাইন ওরা ঘুরেফিরে বারবার গাইছিল–"ন্যায়বিচার এবং শান্তির আবাসস্থল।" একথা ভাবলেও খুব কষ্ট পাই যে, মুসলিমদের প্রতি এতটা অমানবিক হওয়াকে ওরা কিনা সুবিচার মনে করে! পৃথিবীর কোনো দেশের সংবিধানই তো এমন নিপীড়নের অনুমোদন দেয় না।

সময়টা ছিল রক্ত হিম করে দেওয়ার মতো ঠাণ্ডা। বরফ পড়ে পড়ে আমার পুরো শরীর ঢেকে দিয়েছিল। বুঝতেই পারছেন কী পরিমাণ কাঁপুনি ধরেছিল আমার শরীরে তখন।

"নড়বি না একদম!" চিৎকার করে বলছিল সৈন্যরা।

গায়ের কাঁপুনি তখন আমারও নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। এভাবে বিবস্ত্র অবস্থায় তিন ঘণ্টা জমে বরফ হওয়ার পর শেষমেশ আমি জ্ঞান হারাই।

চোখ খুলে দেখি আমি একটা বিশাল রুমের মাঝে। সূর্যের আলো ভেতরে আসছিল। মনে হলো সকাল দশটা বা এগারোটা বাজে। দুঃসহ তীব্র যন্ত্রণাবোধ ছেয়ে ফেলল আমার পুরো শরীর। ধীরে ধীরে চারপাশে তাকালাম। সামনের দিকে দেখলাম দুইজন বিশালদেহী পাকিস্তানী দাঁড়ানো। চোখের জায়গাটা খুলে চেহারার বাকি অংশ কালো ব্যাগে ঢেকে রেখেছে। দুজনই একটি করে শক্ত বড় লাঠি আমার দিকে তাক করে ধরে আছে। তাদের ভুঁড়ি মোটা টায়ারের মতো। তারা প্রস্তুত হচ্ছিল আমাকে মারার জন্য।

চোখ সরিয়ে দুপাশে তাকালাম। দেখলাম আরও দুজন একইরকম শরীর ও পোশাকের লোক আমার মাথায় পিস্তল তাক করে দাঁড়িয়ে আছে। তারা আমার ডানে-বামে দাঁড়িয়েছিল। আরও দুজন আমার দিকে রাইফেল তাক করে ধরে রেখেছিল। তারা সবাই চিৎকার করে উঠে একসাথে তিনটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিল-

- ওসামা কোথায়?
- মোল্লা ওমর কোথায়?
- নিউইয়র্ক এবং ওয়াশিংটন হামলার সময় তোর ভূমিকা কী ছিল?

তাদের পায়ের কাছে বিবস্ত্র পড়ে রইলাম। নিজের জিভ না মুখ কিছুই নাড়াতে পারছিলাম না। খুব, খু-উ-ব করে মৃত্যুকে ডাকছিলাম। কী যে অসহ্য কষ্ট!

আল্লাহ আমার ধৈর্যহীনতা ক্ষমা করুন। কিন্তু কী করব? সেই যন্ত্রণার ভার আমি আর বইতে পারছিলাম না।

আমার কথা বলার শক্তিও নেই বুঝতে পেরে তারা আমাকে ওখানে ফেলে রেখে চলে গিয়েছিল। একা, ভগ্ন, নগ্ন হয়ে আমি ঠাণ্ডা মেঝেতে পড়ে ছিলাম। আল্লাহর কাছে দুআ করছিলাম যেন আমাকে তুলে নেন।

অনেকক্ষণ পর একটা নীলচে কাপড় এনে আমার গায়ে জড়ানো হয়। কাপড়টা আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটা বস্তার মতো ঢেকে দিয়েছিল। দুজন সৈন্য আমাকে ঠেলে প্রায় জীর্ণশীর্ণ একটা কক্ষে নিয়ে যায়। জায়গাটা এত ঠাণ্ডা ছিল, একেবারে বলার বাইরে। আমি আবারও অজ্ঞান হয়ে পড়ি। জ্ঞান ফিরলে দেখতে পাই আমাকে একটি তোশক দিয়ে এমনভাবে মুড়ে দিয়েছে, যেন আমি কোনো লাশবাহী ব্যাগে ঢুকে ছিলাম। একটু নড়তে চাইলাম, কিন্তু হাত-পা এমনভাবে বাঁধা যে মাথাটাও সামান্য বের করতে পারিনি।

চারপাশে তাকিয়ে দেখি সেই ভাঙা রুমেই আছি এখনও। কোনো দরজা-জানালা নেই। সামনে পাহারায় বসে আছে এক মহিলা সৈন্য। একটু পর সে চেয়ার ছেড়ে উঠে এলো। কেমন লাগছে জিজ্ঞেস করে জানতে চাইল আমার কিছু লাগবে কি না। সেবারই প্রথমবারের মতো কোনো আমেরিকান সৈন্যের কণ্ঠে উষ্ণতা, দয়া আর উদ্বেগের ছোঁয়া পেয়েছিলাম।

সে বারবার একই প্রশ্ন করে যাচ্ছিল, কিন্তু আমি কোনো জবাব দিতে পারছিলাম না। ফলে সে জিজ্ঞেস করে বসল, আমি ইংরেজি জানি কি না। এবারও আমার জিভ নাড়াতে পারিনি, তাই সে তার জায়গায় ফিরে যায়।

প্রথমে ভেবেছিলাম হয়তো এতক্ষণে আমাকে কিউবায় নিয়ে আসা হয়েছে। কিন্তু চারদিকের দেয়ালে হস্তলিখিত তালিবানদের কথা সাজানো দেখে বুঝলাম–তখনও আমি আফগানিস্তানেই ছিলাম।

কিছু মানুষের অনেক উচ্চস্বরের কথা শুনতে পেলাম। কারারক্ষীরা এসে সবাইকে চুপ করতে বলল, কিন্তু কোনো বন্দীই তাদের কথায় কান না দিয়ে

কথাবার্তা চালিয়ে যেতে লাগলেন। সেই বন্দীদের থেকে একজন আরব ভাই এসে জানতে চাইলেন আমি জনাব জাইফ কি না। উত্তর জেনে তাঁরা একজন একজন করে এসে নিজেদের পরিচয় দিতে লাগলেন। তাঁরা ছিলেন- ইয়েমেন থেকে সালিম সাক্কার, শেখ ফয়েজ এসেছিলেন কুয়েত থেকে, আলজেরিয়ান সালমান সামী, আফগানিস্তান থেকে ছিলেন মুহাম্মাদ কাসিম হালিম। আরও একজন ছিলেন সেখানে যাঁর নাম এখন আমার মনে নেই।

তাঁরা জানালেন যে তাঁদেরকে একটি আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক দলের দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে আলাদা করে রাখা হয়েছে। তাই তাঁরা সেই দলটির দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এভাবে সব ভয়কে তুচ্ছ করে উচ্চস্বরে কথা বলছিলেন। পাহারাদার সৈন্যদের তাঁরা জিজ্ঞেস করেছিলেন–দরজা কেন বন্ধ করে রাখা হয়েছে। জবাবে তারা বলেছিল যে খুবই অশৃঙ্খল কিছু লোকের একটি দল ঘাঁটিতে ঢুকে পড়েছে। ওই দলের লোকেরা আমাদের দেখলেই মেরে ফেলতে পারে। বুঝে গেলাম ডাহা মিথ্যে একটা গল্প শোনানো হয়েছে আমাদের।

শেষ বিকেল পর্যন্ত আমাদেরকে সেই রুমে একসাথে রাখা হয়েছিল। এরপর ছয়জনকেই সরিয়ে আমাকে আবারও একা করে দেওয়া হয়। ঐ ভাইদের সাথে কাটানো মুহূর্তগুলোই ছিল আমার জন্য গ্রেফতার হওয়ার পর থেকে পার করা শ্রেষ্ঠ সময়।

পরের দিন তাঁদেরকে আবারও সেই রুমে দেখে ভীষণ খুশি হয়েছিলাম। তাঁরা জানালেন যে আমেরিকানরা তাঁদেরকে রেড ক্রিসেন্টের প্রতিনিধি দলের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাইছে। ঐ দলটা আগেরদিনও বন্দীরকে দেখতে এবং তাঁদের চিঠি সংগ্রহ করতে এসেছিল। আমার ভাইয়েরা বুঝতে পারছিলেন না কেন আমেরিকানরা তাঁদেরকে ঐ প্রতিনিধি দলের সাথে সাক্ষাত করা থেকে বিরত রাখতে চাইছে। তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন যে, সম্ভবত মার্কিনীরা ভয় পাচ্ছে যে, তাঁরা পুরো বিশ্বের কাছে আমেরিকার অনৈতিক, অবৈধ গ্রেফতারের গল্প জানিয়ে দিতে পারেন।

একত্রে থাকার সময় আমাদের যথেষ্ট ভালো খাবার দেওয়া হয়েছিল। গ্রেফতার হওয়ার পর সেবারই প্রথম ভালো খাবারের স্বাদ নিয়েছিলাম। আমরা বিভিন্ন ব্যাপারে এবং তৎকালীন অবস্থা নিয়ে কথা বলেছিলাম। কিন্তু

দুইদিন পর তাঁদেরকে সরিয়ে নিলে ঐ রুমে আমি আবারও একা হয়ে পড়ি। ঠাণ্ডা, ভয়ঙ্কর এক রুম; যার খোলা দরজার মুখে শিক লাগানো।

দুইদিন পর আমাকেও বেইসমেন্টে নিয়ে আসা হয়। ওখানে গিয়ে জনাব হালিম এবং সালিম সাক্কারের সান্নিধ্য পাই। সালিম সাক্কারের ঘটনা মনে পড়লে আমার এখনও খুব কষ্ট লাগে। তিনি কাঁদতে কাঁদতে তাঁর একমাত্র মেয়ের কথা বলছিলেন। তার বয়স মাত্র এক বছর, সবে কথা ফুটেছিল মুখে। তিনি বললেন, তখন কান্দাহারে ভয়াবহ বোমাবর্ষণ শুরু হয়েছিল। এক প্রচণ্ড ঠাণ্ডা সকালে তিনি আশ্রয়ের খোঁজ করছিলেন। তাঁর ছোট্ট মেয়েটা কাঁদতে কাঁদতে বলছিল, "অনেক শীত, বাবা।" কিন্তু তাঁর কিছুই করার ছিল না। মেয়েকে কোলে নিয়ে তিনি আর তাঁর স্ত্রী কেবল কান্নাই করে গিয়েছেন।

আমরা তিনদিন একসাথে ছিলাম। তারপর হালিমকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যায়। আমরা সে রাতে তাহাজ্জুদ পড়েছিলাম। পরে আমাদেরকে ওরা বেসমেন্টের অন্যত্র নিয়ে যায়, যেখানে আরও প্রায় বিশজন আটক ছিলেন। তাঁদের হাত পা বাঁধা ছিল, মাথা কালো ব্যাগ দিয়ে চোখমুখ ঢেকে রেখেছিল। আমাকে বলা হলো একজনের পিঠে পিঠ লাগিয়ে বসার জন্য। বসলাম ওভাবে। আমার মাথা তাঁর কাঁধে, তাঁর মাথা আমার কাঁধে। এরপর ওরা বলল হাঁটুতে ভর দিয়ে বসতে।

এমতাবস্থায় দীর্ঘ একটা ঘণ্টা বসে রইলাম লাইন ধরে। এরপর ঐ অবস্থায়ই উটের মতো করে আমাদের সবাইকে একটি প্লাস্টিকের দড়ি দিয়ে বাঁধা হলো। দড়ির দুইপাশ ধরে দুইদিক থেকে সৈন্যরা এমন জোরে টানতে শুরু করল যে, আমাদের চামড়া কেটে সেটা ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল। কাঁধের মাংস কেটে হাড় পর্যন্ত চলে গিয়ে যে ব্যথার জন্ম দিয়েছিল সেই দড়িটা, তার মতো অসহ্য যন্ত্রণা আর কখনো হয়নি আমার।

আমাদের মর্মভেদী চিৎকার শুনেও সৈন্যগুলোর কোনো ভাবান্তর হয়নি। তারা রক্ত বের করেই যেতে লাগল। জনাব নাফী ছিলেন আমাদের পাশের লাইনে। তাঁর দুই পায়ে খুব খারাপভাবে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছিল। তীব্র যন্ত্রণায় তিনি চিৎকার করছিলেন। অথচ ওসব সেনাসদস্য উল্টো ধমক দিয়ে তাঁকে বলছিল, "আওয়াজ বন্ধ কর্।"

ঐ লাইনে জনাব আমিনুল্লাহও ছিলেন। পরবর্তীতে কান্দাহারে তিনি আমাকে সেদিনের ঘটনায় আহত একজনের কথা বলেছিলেন। আহত ভাইটি ছিলেন একজন আরব। তাঁকে যখন ওরা রুমের বাইরে নিয়ে যাচ্ছিল, দেখে আমিনুল্লাহর মনে হচ্ছিল যেন জবাই করার জন্য একটা পশুকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

আমাদের সবার কাছেই মনে হচ্ছিল এটাই জীবনের শেষ দিন। ভয়াবহ সেই সময়টাতে অনেকেই কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করছিলেন। কেউ কেউ পড়ছিলেন কুরআনের বিভিন্ন আয়াত, যেন একটু আরাম লাগে, একটু ভুলে থাকতে পারেন।

এবড়োথেবড়ো জমিনের ওপর দিয়ে হালের বলদের মতো আমাদের টেনে এক জায়গায় আনা হয়। একটি প্লেনের শব্দ শুনলাম। সেখানে ছুঁড়ে ছুঁড়ে আমাদের একজনের ওপর অন্যজনকে ফেলা হয়। এরপর প্রত্যেককে প্লেনে তোলা হয়।

আরও একবার ধাতব মেঝের সাথে আমাদেরকে শক্ত করে বেঁধে দেয় ওরা। আগের ক্ষত, তার ওপর নতুন বাঁধনের ফলে শরীর কাঁপানো ব্যথায় সবাই চিৎকার করছিলাম। আর প্রতি চিৎকারের বিনিময়ে জুটছিল ধুম ধুম বুটের লাথি। সেবারের যাত্রাটা খুব অল্প সময়ের ছিল। এক ঘণ্টাও হবে না। কিন্তু এর যন্ত্রণা ছিল অবর্ণনীয়।

কান্দাহার

৯ই ফেব্রুয়ারি ২০০২ সালে প্লেনটি অবতরণ করে। এক ঝটকা মেরে আমাকে নামিয়ে আবারও টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয় কর্দমাক্ত জমির ওপর দিয়ে। এমনিতেই পুরো শরীরে কালশিটে পড়ে গিয়েছিল, তার ওপর লাথি-গুঁতো মারতে মারতে এভাবে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার ফলে শরীর যেন ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছিল। শুধু আমিই না, অন্যদেরও চিৎকার কানে আসছিল। তাই বুঝতে পারছিলাম তাদের ভাগ্যেও একই আচরণ জুটেছে। মাটি ছিল একেবারে ঠাণ্ডা আর ভেজা। পরিহাসের বিষয় হলো, মাথায় লাগিয়ে রাখা সেই কালো ব্যাগের কারণে চোখমুখে কিছুটা উষ্ণতা পাচ্ছিলাম আমি।

যে লোকগুলো আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল তারা হঠাৎ আমাকে ঘুষি, লাথি মারতে শুরু করল। এই মারের যেন শেষ নেই। এরপর আমাকে আলুর বস্তার মতো ছুঁড়ে মেরে উপুড় করে ফেলা হয় আর পিঠের ওপর পাঁচজন বসে আদেশ করে, "নড়বি না, খবরদার।" আরও একবার ধারালো ছুরি দিয়ে আমার কাপড় টুকরো টুকরো করে কাটে ওরা। বুট পরা কেউ একজন আমার মাথার ওপর দাঁড়িয়ে ছিল তখন।

নিশ্চিত বুঝে গেলাম আমাকে কুরবানীর পশুর মতো জবাই করে ফেলবে এখন। সত্যি বলতে, আল্লাহ যদি আমার জন্য এমন মৃত্যু লিখে রাখেন, তার জন্য তখন প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলাম। মৃত্যু হলে অন্তত সমগ্র মানবতার বিরুদ্ধে গিয়ে করা এসব অন্যায়-অবিচার থেকে মুক্তি পেতাম।

অনেকক্ষণ পর আমাকে বিবস্ত্র অবস্থায় দাঁড় করানো হয়। হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা চারিদিকে। অথচ ব্যথার যন্ত্রণায় পুরো শরীর থেকে যেন ধোঁয়া বেরুচ্ছিল। ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে বাঘ যেমন ছাগল টেনে নেয়, সেভাবে আরও একবার টেনে নেওয়া হয়েছিল।

অবমাননাকর জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হলে মনে হচ্ছিল যেন আমার বন্দীত্ব এবং নিপীড়িত অবস্থা তাদের পাশবিক আনন্দ দিচ্ছে। পুরুষ এবং মহিলা সৈন্যদের সামনে এভাবে পুরোদস্তুর উলঙ্গ দাঁড়িয়ে থাকাটা তাদের কাছে উদযাপনের মতো বিষয় ছিল; আমার জন্য যা কেবলই লজ্জার।

মাথা থেকে ব্যাগ এবং চোখের বাঁধন হেঁচকা টানে খুলে নেওয়া হয়। চোখে আলো সয়ে এলে দেখলাম আরও বহু ভাইকে একইরকম বিবস্ত্র অবস্থায় একটি বিরাট তাঁবুর নিচে দাঁড় করিয়ে ছবি তুলছে অনেক নারী-পুরুষ ফটোগ্রাফার। জিজ্ঞাসাবাদের পর কিছু মেডিক্যাল চেকআপ করিয়ে নতুন পোশাক পরানো হয়। আরও একবার মাথা, চোখ কালো ব্যাগে ঢেকে মাটির ওপর দিয়ে টেনে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

আমাকে অন্য কোথাও নিয়ে যায় ওরা। যারা টেনে আনছিল তারা একসময় মুখোশটা খুলে দিয়ে আমার পিঠের ওপর বসে আরাম করে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই আমাকে উঠে দাঁড়াতে বলে। দাঁড়িয়ে আমি গা থেকে ধুলামাটি ঝেড়ে নিলাম।

চারপাশে তাকিয়ে দেখি একটি বড় তাঁবুর নিচে আছি। চারপাশে কাঠের বেড়া দেওয়া। তাঁবুর আয়তাকার মেঝে মাটি থেকে অন্তত এক মিটার ওপরে। কোনো এক সৈন্য আমার বিছানা দেখিয়ে দিলো। সেখানে জামা, মোজা, জুতা আর একটি হ্যাট রাখা ছিল। প্রত্যেক বন্দীই একই পোশাক পেয়েছে। কাপড়-মোজা পরে, মাথায় হ্যাটটা টেনে আমি কম্বলের ওপর শুয়ে পড়লাম। বাইরের ঠাণ্ডার তুলনায় ভেতরে সামান্য গরমও ছিল না।

আরও অনেক বন্দীকে ঐ তাঁবুতে আনা হয়। একজনকে দেখে চিনতে পারলাম। ওর্জগান প্রদেশের বালাগ গ্রামের মোল্লা মোহাম্মদ সাদিক আখন্দ। রাশিয়া যুদ্ধের সময় তিনি আমাদের সিদ্দীকা ফ্রন্টের কমান্ডার ছিলেন। তাঁকে যখন আনা হয় তখন প্রায় সকাল হয়ে এসেছে। শীতে কাঁপছিলেন তিনি। তাঁকে কাপড় পরতে সাহায্য করার জন্য আমি এগিয়ে গেলাম।

তিনি খুবই অপমানিত বোধ করছিলেন। লজ্জায় কুঁকড়ে গিয়ে আমাকে বললেন তাঁর দিকে না তাকাতে। অবশ্যই আমি তাকাইনি, আমি শুধু তাঁকে কাপড় পরতে সাহায্য করছিলাম। সেই মুহূর্তের কথা আমি ভুলতেই পারি না যখন মোল্লা সাদিক আমাদের চারপাশে বহু লোককে শুয়ে থাকতে দেখে আমাকে বলেছিলেন, "লাশগুলো দেখ।"

আমি বললাম, তারা ঘুমুচ্ছে, মরে যায়নি।

অল্প কিছুক্ষণ পরই আমরা তাঁবুর চারপাশ থেকে আজানের ধ্বনি শুনতে পেলাম। বুঝলাম এমন এক জায়গায় এনে আমাদের রাখা হয়েছে

যেখানে আছে অনেক মসজিদ। আজার ঐ সুমধুর সুরে আমাদের অন্তর ভরে গেল।

"আলহামদুলিল্লাহ," মোল্লা সাদিক বললেন, "সমস্ত কৃতজ্ঞতা আল্লাহর প্রতি, কারণ আমরা ইসলামের কোনো ভূমিতেই আছি।"

জনাব আমিনুল্লাহ বলে উঠলেন, এমন অসহ্য যন্ত্রণার মাঝে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই ভালো। আমি তাঁকে সান্ত্বনা দিলাম এবং বললাম, আল্লাহ নিশ্চয়ই আমাদের এখনের চেয়ে খারাপ পরিস্থিতি থেকে হেফাজত করবেন।

ফজরের পর আমরা ভাবলাম এবার একটু বিশ্রাম নিয়ে নিই আর ঠিক তখনই জিজ্ঞাসাবাদকারীরা ফিরে এল। তারা প্রথমে আরব ভাইদের ডেকে নিয়ে গেল। ঐদিন আমাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয়নি। যাইহোক, যখনই ওরা একজনকে ডেকে নিয়ে যেত তখন অন্য সবাইকে তাঁবুর একেবারে কিনারায় দাঁড়াতে বাধ্য করত। আমাদের হাঁটু তাক করে রাইফেল ধরে রাখত আর আমরা দাঁড়িয়ে থাকতাম মাথার পেছনে হাত তুলে।

যাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে তার কাছে সৈন্যরা দৌড়ে আসত। তাকে উপুড় হয়ে শুতে বলে এক সৈন্য তার ওপর বসত। অন্যজন তার হাত-পা শক্ত করে বেঁধে মুখে কালো ব্যাগ পরিয়ে দিত। এসব করার পর বন্দীকে টেনে নিয়ে দরজায় আবার তালা মেরে দিত। এসব করার পর আমাদের ওপর আদেশ হতো যার যার জায়গায় ফিরে যাওয়ার।

এরকম কঠিন পরিস্থিতিতে রাত-দিন পার হতে লাগল। একটু ঘুমিয়ে নেওয়া বা বিশ্রাম করার উপায় ছিল না কারও। সিরিয়ালে পরেরজনের ডাক পাওয়ার আতঙ্কে সবাই তটস্থ থাকতাম।

আমেরিকানরা ইচ্ছে করেই বন্দীদেরকে আঘাত করত এবং পঙ্গু করে দিত। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য জঘন্যভাবে অমসৃণ মাটির ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হতো। তাদের মাথা চেপে রাখা হতো নিচের দিকে, আর কতগুলো কুকুর তখন ভয়ঙ্করভাবে ডেকে চলত। আমার ট্রাউজার ঐ মাটিতে ঘষা খেয়ে এতবার এত জায়গায় ছিঁড়েছে যে, আমার পা এবং হাঁটু ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল এখানে ওখানে। প্রতিবার আমাদের মাথা দেয়ালের সাথে চেপে ধরে

জোরে জোরে আঘাত করা হতো। চোখ বাঁধা অবস্থায় দেয়ালের আঘাত ঠেকানোর কোনো উপায়ই আমাদের থাকতো না।

এক সকালে রেড ক্রিসেন্টের একটি প্রতিনিধিদল এসেছিল আমাদের দেখতে। তারা আমাদের সাক্ষাৎকার নিয়ে কিছু ফর্ম দিলো, যদি আমাদের পরিবারকে লেখার কিছু থাকে তা যেন লিখে দিই। একজন প্রতিনিধি সীমানা ঘেরা তারের পেছনে দাঁড়িয়ে আমাকে সৈন্যদের আচরণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। কিন্তু আমাদের সবার সন্দেহ হচ্ছিল, এই লোকগুলো CIA-এর এজেন্ট। আমাদেরই বরং অনেক অনেক প্রশ্ন ছিল, যেগুলোর উত্তর জানা জরুরী।

রেড ক্রিসেন্টের মাধ্যমে চিঠির আদান-প্রদান ছিল আমাদের পরিবারের খোঁজখবর জানার একমাত্র সন্তোষজনক উপায়। আমরা রেড ক্রিসেন্টের নিবন্ধনভুক্ত হয়েছিলাম এবং একটি করে পরিচয়পত্রও দেওয়া হয়েছিল আমাদের। তারা আমাদের বইপত্র, পানি, ওষুধ, পুষ্টিকর খাবার এবং আরও যা যা লাগে তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

আমরা তখন ছিলাম কান্দাহারে, কিন্তু আমাদের জীবনে তেমন কোনো পরিবর্তনই আমি দেখিনি। পরিবর্তন যা এসেছিল তা বললে বলতে হয়-কয়েকটা ছোটগল্পের বই, দাবাঘুঁটি এবং বিব্রতকর এক অবস্থায় গোসল করার কথা। মাসে একবার প্রত্যেক বন্দী গোসল করার সুযোগ পেত। সবার সামনে, সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে। বহুবার ভীষণ গুরুত্বের সাথে তাদের বলেছি আমাদের কিছু ধর্মীয় বই দিতে, অজু করার জন্য পর্যাপ্ত পানি দিতে এবং বন্দীদের সাথে একটু মানবিক আচরণ করতে। কিন্তু কিছুই হয়নি।

কান্দাহারে আমি ছিলাম ২০০২ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে ১ জুলাই পর্যন্ত। এই পুরোটা সময়জুড়ে, মানে প্রায় এই পাঁচ মাস যাবৎ আমি নিজের মুখ বা হাত একবারও ধুইনি। সামান্য কিছু পানি দেওয়া হতো পান করার জন্য। সেখান থেকে বাঁচিয়ে মাঝেমধ্যে আমরা হাত-মুখ ধুতাম। কিন্তু একবার এমনটা করতে গিয়ে ধরা পড়ে গিয়েছিলাম। ফলাফল, আবারও ভয়ানক অত্যাচার।

একবার আমাদের সাতজনকে একসাথে বাঁধা হয়েছিল। তারপর সব জামাকাপড় খুলে হাতে একটি বালতি আর সাবান ধরিয়ে দিয়ে বলা হয়েছিল

গোসল করতে। তাদের কথা শুনতে বাধ্য হয়েছিলাম, যেহেতু আর কোনো উপায় ছিল না। আমি দলের অন্যদের বলেছিলাম চোখ বন্ধ রেখে তাড়াতাড়ি গোসল শেষ করতে, বা অন্তত যার যার নিজের দিকে তাকিয়ে থাকতে, যেন এমন অসম্মানের কবল থেকে নিজেরা নিজেদের বাঁচাতে পারি। সেবারই প্রথম গোসল করার সুযোগ পেয়েছিলাম, সেটাই ছিল শেষ।

জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আমাকে দ্বিতীয়বার ডাকা হয়। এবার অবশ্য তাদের আচরণে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। একটা ছোট তাঁবুতে হয়েছিল জিজ্ঞাসাবাদ কার্যক্রম। শুরুতে আমার নিজের সম্পর্কে, আমার কর্মজীবন সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল। অন্যবারের তুলনায় এবারের প্রশ্নগুলো করছিল খুবই নম্রভাবে, সম্মানের সাথে। অবশ্য ধরন পাল্টালেও প্রশ্ন ছিল সেই আগেরগুলোই। দোভাষীর সাহায্যে একজন আমার সাথে কথা বলছিল আর দরজার সামনে পাহারা দিচ্ছিল কয়েকজন সৈন্য।

টেবিলে একাধিক লাল ফাইল দেখেছিলাম। ওগুলোর রঙ লাল হওয়ার কারণ পরে বুঝেছি, যখন লোকটি আমাকে শাইখ ওসামা বা মোল্লা ওমরের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছিল। প্রশ্নোত্তর পর্বটি দুই ঘণ্টা স্থায়ী হয়েছিল এবং পরদিনও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল। দুবারই আমার মাথা ছিল পুরোপুরি ঢাকা এবং তাঁবুতে ফেরানো হয় হিংস্রতার সাথে।

কান্দাহারের তাঁবু-কারাগারের প্রতিটা তাঁবুতে বিশজন থাকার মতো জায়গা ছিল। আমাদের তাঁবুতে কখনো দশজন কখনো বিশজন থাকত। মাঝেমধ্যে একসাথে তিনজন বসে কথা বলার অনুমতি পেতাম। কখনো ওরা তিনজনের বেশি একসাথে দেখলেই শাস্তি দিত। দিনে পাঁচবার জামাতে নামাজ পড়ার অনুমতি অবশ্য ছিল। তাঁবুর আশপাশে কখনো আধোঘুমে আমরা তিনজনের দল নিয়ে হেঁটে বেড়াতাম। শীতকালে জেলের শিক গলে নামা রোদে সামান্য সময় বসার অনুমতি পেতাম।

কিন্তু কান্দাহারে দুর্ভোগের যেন শেষ ছিল না। প্রতি মাঝরাতে সৈন্যরা ঝড়ের বেগে তাঁবুতে ঢুকে পড়ত। চিৎকার করে বলত মাথা নিচু করে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকতে যেন আমাদের দেহ তল্লাশি করতে পারে। মাঝরাতের এই অত্যাচারের মুখোমুখি হতো প্রায় ছয়শ বন্দী, প্রতিরাতে।

সৈন্যরা কুকুর নিয়ে ঢুকত এবং একে একে সবাইকে তল্লাশি করত। একজনকে তল্লাশি করার সময় অন্যদের পাঠিয়ে দিত তাঁবুর শেষ সীমায়। কয়েকদিন এমন ঘটনা ঘটার পর অনেকেই ভয়ে, আতঙ্কে ইনসমনিয়ায় (ঘুমুতে না পারার অসুখ) আক্রান্ত হয়ে পড়েছিল।

মিলিটারিদের জন্য প্যাকেট করা খাবার দেওয়া হতো আমাদের। সত্যি বলতে, খাবারগুলো প্যাক করা হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সৈন্যদের জন্য। বুঝতেই পারছেন বহু বছর আগেই সেগুলোর মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এছাড়া ওসব খাবারের মধ্যে সবজি এবং মাংসও থাকত। কিন্তু সেসব মাংস হালাল কি না সেটা বুঝতে পারতাম না। মাঝেমধ্যে দেখা যেত আমাদের কোনো ভাই ভুলে শূকরের মাংস খেয়ে ফেলেছে ইংরেজি পড়তে না পারার কারণে।

সরবরাহকৃত খাবারগুলো প্রায়ই থাকত পঁচা আর বিশ্রী দুর্গন্ধযুক্ত। আমাদের সংস্কৃতির একটি অংশ হলো ভালো এবং স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া। অথচ আমরা উপোস থাকতাম এবং কখনো কখনো আমাদেরকে জোর করে খাওয়ানো হতো।

রমজান মাসে আমাদেরকে *হালাল* লেখা খাবার দেওয়া হয়েছিল। সাথে ছিল কোশের (ইহুদিদের জন্য বৈধ)। অনেক মুসলিমই মনে করতেন কোশের খাওয়া তাদের জন্যও বৈধ। এই খাবার আর্মি রেশনের চেয়ে ভালো এবং তুলনামূলক সতেজও ছিল। আর যখন আফগানে তৈরী রুটি এবং ক্যান্ডি দেওয়া হতো, তখন যেন বন্দীদের মনে উৎসব বয়ে যেত। বড় বক্সে করে খাবার নিয়ে এসে তাঁবুগুলোর সামনে রাখা হতো। এরপর ছোট একটি ছিদ্র দিয়ে প্রত্যেককে এক বোতল পানি আর এক প্যাকেট খাবার দেওয়া হতো। কোনো কোনো ভাই অবশ্য নিজেদের জন্য দুই প্যাকেট খাবার নেওয়ার মতো অপরাধ মাঝেমধ্যে করে ফেলেছেন। আল্লাহ তাদের ক্ষমা করুন। যাইহোক, ত্রিশ মিনিটের মধ্যে খাবার-দাবার শেষ না হলে শাস্তি পেতে হতো।

টয়লেটের কাজ সারার জন্য একটি বালতি দেওয়া হয়েছিল, যা একটি পাতলা কাপড় দিয়ে ঘেরা ছিল। একজন গার্ড এবং বিশজন বন্দীর সামনে কোনো গোপনীয়তাই ছিল না। প্রতিদিন এক রোল টয়লেট পেপার দেওয়া

হতো। একেকদিন একেকজন বন্দীর ওপর একজন সৈন্যের তদারকিতে ঐ বালতিগুলো পরিষ্কার করার দায়িত্ব পড়ত।

সেখানকার চিকিৎসা সেবা ছিল একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ের। আহত বা অসুস্থদের জন্য দিনে তিনবার মহিলা নার্সের শরণাপন্ন হওয়ার সুযোগ ছিল। এদিকে তাদেরও যথেষ্ট সরঞ্জামাদি ছিল না। যেকোনো পরীক্ষাই চলত একটি থার্মোমিটার আর স্টেথোস্কোপ দিয়ে। রোগীদের দেওয়া হতো কেবল বারবিটুরেট (Phenobarbital) জাতীয় ওষুধ। জ্বর, কোষ্ঠকাঠিন্য, সর্দি-কাশি কমাতে শুধু পানি খেতে বলা হতো। অবশ্য ওসব ওষুধের চাইতে এটা অনেক ভালো পথ্য বলা যায়।

আমাদের তাঁবুর খুব কাছেই ছিল বিমান অবতরণের জায়গা। বিমান ওঠা-নামার শোঁ শোঁ শব্দ আমাদের অনবরত বিরক্ত করত তা বলাই বাহুল্য। এর ফলে আমাদের খাবার-দাবারও ধুলোয় ভরে যেত। বিমানের গর্জন আমাদের কান ফাটিয়ে দিত, বিশেষত মাঝরাতে। চমকে ঘুম থেকে জেগে উঠতাম তখন আমরা। আর এত শব্দ এবং ধুলোর কারণে যে মাথাব্যথাটা হতো, তা একেবারে পাগল করে দিত আমাদের।

এর সাথে ছিল মাঝরাতে পাহারায় থাকা সৈন্যদের অত্যাচার। তারা তাঁবুগুলোর আশপাশ দিয়ে যাওয়ার সময় অযথা চিৎকার চেঁচামেচি করত যেন আমরা ঠিকভাবে ঘুমুতে না পারি। অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করত। অন্যের প্রতি শ্রদ্ধার এমন দৈন্যতা আমাদের মুসলিম সংস্কৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত।

প্রতি ২৪ ঘণ্টায় সৈন্যরা তিনবার করে আমাদের রোল কল করত। সব বন্দীকেই একটি সিরিয়াল নাম্বার দেওয়া হয়েছিল। আমার নাম্বার ছিল ৩০৬। যখন একেবারে পুরোপুরি মুক্তি পেয়েছিলাম, তখনও আমার সিরিয়াল ৩০৬ ছিল।

পাশবিকতার চূড়ান্ত

আমার এখনও দুটো ঘটনা মনে পড়ে। যে সৈন্যরা আমাদের নাম ডাকত, তারা প্রতিদিন দুইবার ঘুরে-ফিরে আসত। আমাদেরও দিনে-রাতে দুবার উপস্থিতি জানান দিতে হতো।

একবার এক সৈন্য এসে আমাদের লাইনে দাঁড় করালো। দোভাষীকে বলল তার কথা আমাদের বুঝিয়ে দিতে। সে বলেছিল, যখনই সে রোল কল করতে আসবে তখনই আমাদের সবাইকে তাঁবুর সামনে লাইনে দাঁড়িয়ে তাকে স্যালুট দিতে হবে। বলেছিল যতক্ষণ সে নাম ডাকবে ততক্ষণ সবার মুখ বন্ধ রেখে নিচের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে। কেউ ওপরে তাকাতে পারবে না।

সে আরও জানিয়েছিল, যার নাম বা নম্বর ডাকা হবে তাকে অবশ্যই 'ওয়েলকাম' বলে জবাব দিতে হবে। তারপর সামনে এসে নিজের নম্বর দেখিয়ে না ঘুরে পেছন দিকে হেঁটে বসার জন্য তার অনুমতির অপেক্ষা করতে হবে। যদি কেউ তার কথার অন্যথা করে বা কোনো একটি অংশ ভুল করে, তাকে শাস্তি দেওয়া হবে।

এসব কথাবার্তা শুনে আমি মোটেও অবাক হইনি। এরা সাধারণত নিচু পদের সৈনিক হতো। তাই কর্তৃত্বের দাপট দেখিয়ে আমাদের ভয় দেখাতে চাইত। অথচ এর সিকিভাগ ক্ষমতাও তাদের ছিল না। মুসলিম বন্দীদের প্রতি সব সৈন্যই আলাদা আক্রোশ দেখাত, কিন্তু আমাদের মধ্যকার সাহসী এবং ঈমানদার ব্যক্তিরা ওসব আস্ফালনকে তেমন পাত্তাই দিতেন না।

একবার একজন এসে আমাদের নাম ডাকার জন্য লাইনে দাঁড় করালো। গ্রীষ্মের দুপুরের কড়া সূর্য মাথার ওপর জ্বলছিল। অন্যদিনের চেয়ে আধাঘণ্টা আগে সেদিনের নাম ডাকা শুরু করেছিল। বিশটি তাঁবুর প্রায় আটশ বন্দীর নাম ডাকার মানে হলো ঘণ্টার পর ঘণ্টা কড়া রোদে দাঁড়িয়ে থাকা।

বন্দীদের সারির মাঝ দিয়ে মিলিটারি একনায়কের মতো আলগা গাম্ভীর্য নিয়ে হেঁটে যেতে যেতে নামের তালিকা দেখছিল। আমার জীবনে আমি এতটা দাম্ভিকতা নিয়ে কাউকে হাঁটতে দেখিনি। সে ইচ্ছে করেই খুব ধীরে ধীরে হাঁটছিল যেন আমাদের কষ্টকর অপেক্ষার প্রহর আরও বাড়ে। বারবার থেমে অন্য সেনাদের সাথে ফিসফিসিয়ে কথা বলে আরও দেরি করাচ্ছিল। যদি কেউ সামান্য একটু বসত বা ছায়ায় গিয়ে দাঁড়াত তাহলেই তার গালাগালির লাগাম ছুটে যেত। এমনকি কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না এমন অসুস্থদেরও সে এতটুকু ছাড় দেয়নি। একাজ সে প্রায় দুই মাসের প্রতিদিন করে গেছে।

এমন অত্যাচারী আচরণের কোনো মানে আমি খুঁজে পাই না। যেখানে আল্লাহ বলেছেন একেবারে সিংহ থেকে শুরু করে সামান্য ফড়িংয়ের জন্য পর্যন্ত সুবিচার এবং সম্মান রাখতে হবে, সেখানে একটা মানুষ কীভাবে পারে আরেকজন মানুষের সাথে এত অন্যায় আচরণ করতে? তখন আমি আল্লাহর কাছে দুআ করতাম যেন তাকে তিনি কঠিন শাস্তি দেন।

আরেকদিন এই লোক আমাদের তাঁবুর সীমানা-ঘেরা তারের চারপাশ দিয়ে হাঁটছিল। হাউন্ড কুকুরের মতো ছিল তার কাজ-কারবার। প্রতিটা জিনিস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল, নাক টেনে সেগুলোর ঘ্রাণ শুঁকছিল। হঠাৎ একটা কাঁচের টুকরা পেয়ে সে আমাকে দিলে আমি ওটা আবার তার দিকে ছুঁড়ে ফেললাম। এটা কোত্থেকে এসেছে, মানে আমি কোথায় পেয়েছি তা জানতে চাইল। বললাম আমরা কেউই এমন কিছু আনিনি এবং সে সুযোগও আমাদের নেই। বললাম, হয়তো আগে থেকেই ওটা ওখানে পড়ে ছিল। সে কোনো কথাই বিশ্বাস করতে চাইল না। চিৎকার করে বলল,

"চোওপ! তোকে খেয়ে ফেলব একদম, দাঁড়া।"

হাঁটু গেড়ে হাতের ওপর ভর দিয়ে আমাকে বসতে বলা হলো। এভাবে বসে ছিলাম প্রায় কয়েক ঘণ্টা। আর পুরোটা সময় জুড়ে সে আমার চারপাশ ঘুরে হেঁটেছে, পিটিয়েছে আর চেঁচিয়ে গেছে।

আমরা এগুলোর ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন করতাম না। নিজেদের বাঁচানোর কোনো চেষ্টা করতাম না। করলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতো, অত্যাচারের

মাত্রা আরও বেড়ে যেত। সেখানে প্রতিউত্তর দেওয়া ছিল অপরাধ, তাদেরকে অপমান করার শামিল।

সেসময় অন্তরে যে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছিল তার ব্যথা আমি আজও বয়ে বেড়াই। পশ্চিমা সেক্যুলারদের দাসত্ব করা আমাদের মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানদের দেখে, মুসলিমদের মধ্যকার অনৈক্য দেখে, ইসলাম থেকে তাদের দূরে সরে যাওয়া দেখে আমি বিস্মিত হই। কীভাবে ঐসব 'মুসলিম' শাসকরা পারল আল্লাহ যাকে অবৈধ ঘোষণা করেছেন তাকে বৈধ করতে? কীভাবে তারা ইসলাম ছেড়ে অন্যদের সাহায্য নিতে পারছে, যাদের কি না একমাত্র চেষ্টাই হচ্ছে পৃথিবীর সর্বত্র মুসলিমদের নামে কুৎসা রটিয়ে বেড়ানো? আল্লাহর কাছে সেইসব পথভোলা নেতৃবৃন্দের হেদায়াতের দুআ করি।

কান্দাহার কারাগারের একটা অংশ এককালে এরোপ্লেনের ওয়ার্কশপ হিসেবে ব্যবহৃত হতো। সেখানে থাকা বন্দীদের অবস্থা ছিল ভয়াবহ করুণ। কিছু বন্দীকে দেখেছিলাম, গায়ে জড়ানো ভারী শিকলের কারণে তাদের শরীরে ক্ষত তৈরি হয়েছে। কারাগারে কাঠের তৈরী ছয়টি পর্যবেক্ষণ বুথ ছিল। অস্ত্রধারী সেনারা সবসময় পাহারায় থাকতো, চব্বিশ ঘণ্টা তারা ঘুরে ঘুরে পাহারা দিত। কেউ কেউ গাড়িতে চড়ে পাহারা দিত।

আরেক জায়গায় আটটি ছোট খাঁচায় থাকত কুকুর। কুকুরগুলো মাঝরাতে আকাশ ফাটিয়ে গর্জন করত, সৈন্যরাও তখন চিৎকার করত। এভাবে গর্জন আর চিৎকার করাও ছিল আমাদের শাস্তি দেওয়ার একটি অংশ। তাদের ওপর আদেশ ছিল, আমরা যেন ঘুমুতে না পারি।

ব্যাপারটাকে আরও জটিল করার জন্য আলাদা একটি জায়গাও ছিল। যেখানে একজনকে দিনের চব্বিশ ঘণ্টা এক থেকে চারমাস পর্যন্ত সজাগ রাখার ব্যবস্থা ছিল। দীর্ঘদিন নির্ঘুম থাকার ফলে বহু বন্দীই শারীরিক এবং মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিল।

ওখানে এমন কিছু নির্মম অত্যাচারের ঘটনা আছে, যেগুলো আমরা কখনোই ভুলতে পারব না। কক্ষনো না। একবার অশীতিপর এক বৃদ্ধলোককে পেছনে হাত বেঁধে নিয়ে আসা হয়েছিল। ভয়ঙ্করভাবে ধাক্কা মেরে তাঁকে আমার পাশে ফেলেছিল সৈন্যরা। এরপর তাঁর বাঁধন খুলে দিয়ে ওরা তাঁবু ছেড়ে চলে যায়। লোকটি এতই দুর্বল ছিলেন যে উঠে দাঁড়ানো তো দূরে

থাক; কথা বলতে, এমনকি শ্বাসও নিতে পারছিলেন না। তিনি অস্পষ্ট বিড়বিড় করে যাচ্ছিলেন। তাঁর জীবনে ঘটতে থাকা ঘটনাগুলোর কারণে বিহ্বলতায় আচ্ছন্ন হয়ে তাঁবুর মুসলিমদের পর্যন্ত সৈন্যদের থেকে আলাদা করতে পারছিলেন না।

পরদিন কয়েকজন সৈন্য এলো তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যেতে। তারা তাঁকে শুয়ে পড়তে বললেও তিনি কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। আমরা যে তাঁকে তাদের কথা বুঝিয়ে দেব বা কোনোরকম প্রতিবাদ না করে ওরা যা চাইছে শান্ত থেকে তা-ই করে যেতে বলব সে উপায়ও ছিল না। অনুমতি নেই কথা বলার। এদিকে সৈন্যরা আমাদের বলল তাঁবুর সীমানায় গিয়ে দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়াতে। এরপরই একজন লাথি মেরে তাঁকে মাটিতে ফেলে দিলো। অন্যজন তাঁর ওপর বসে তাঁর হাত-পা বেঁধে ফেলল।

বৃদ্ধ লোকটি ভেবেছিলেন তাঁকে শিরশ্ছেদ করা হবে। ভয়ে চিৎকার করে তিনি বলছিলেন যেন তাকে অন্তত শেষবারের মতো নামাজ পড়তে দেওয়া হয়।

"আরে কাফেরের বাচ্চারা! আমাকে শাহাদাতের নামাজটা হলেও পড়তে দে।" সেনারা অবশ্য তাঁর আবেদনের কিছুই বোঝেনি। একদিকে তিনি গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে যাচ্ছিলেন, অন্যদিকে আমরাও জোরে জোরে তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করছিলাম যে তাঁকে হত্যা করা হবে না। শীঘ্রই তিনি আমাদের কাছে আবার ফিরে আসবেন। কিন্তু বেচারা বৃদ্ধ আমাদের কথাও বুঝতে পারছিলেন না। হতাশায় আমি কান্নাই করে ফেললাম। আমাদের ধর্মে তো আমরা শিখেছি বড়দের শ্রদ্ধা করতে, সম্মান দেখাতে।

পরে যখন জিজ্ঞেস করেছিলাম, আমাদের অবাক করে দিয়ে তিনি বলেছিলেন তাঁর বয়স ১০৫। তিনি ছিলেন ওরোজগান (Orozgan) প্রদেশের চারশিনো (Charchino) গ্রামের অধিবাসী। যাইহোক, আমাদের ঐ নরক থেকে তিনিই প্রথম ছাড়া পেয়েছিলেন।

আরেকবার আমরা জামাতে ফজরের নামাজ পড়ছিলাম। আমি ছিলাম ইমাম। এমন সময় কয়েকজন সৈন্য এসে এক আরব ভাইয়ের সিরিয়াল নম্বর ধরে ডাক দেয়। কিন্তু নামাজে থাকায় কেউ কোনো জবাব দিতে পারলাম না। একটু পর অধৈর্য কণ্ঠে আবারও তাঁর নম্বর ধরে ডেকে ওঠে

ওরা, 'তাড়াতাড়ি'। তৃতীয় বার যখন কণ্ঠে আগুন জ্বেলে তার নম্বর ডাকা হলো, তখন সবে আমরা রুকু থেকে উঠে সিজদায় যাচ্ছি। দুইজন সেনা হঠাৎ এসে আমার মাথার ওপর বসে পড়ল। ওরা আমার মাথা মাটির সাথে চেপে রেখেছিল, ওদিকে তাদের সঙ্গীরা তিউনিসীয় আদেল ভাইকে টেনে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে গিয়েছিল। তাঁকে নিয়ে যাবার পর ভগ্ন হৃদয়ে, আর্দ্র চোখে আমরা আবারও নামাজে দাঁড়ালাম।

আমাদের ধর্মীয় মর্যাদার ওপর এটি ছিল এক চরম অপমান। আমাদের এটুকু বিশ্বাস ছিল যে আমরা শান্তিতে অন্তত নামাজটা পড়তে পারব। কিন্তু তারা হিংস্রতার সাথে ভদ্র আচার-ব্যবহারের সমস্ত নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আমাদের এই চমৎকার ইবাদত-পদ্ধতিতে বাগড়া বাধিয়েছে।

কনসার্টিনার (concertina) তার দিয়ে তাঁবুগুলো আলাদা করা থাকত। একদিন দুপুরের খাবারের সময় আমাদের পাশের তাঁবুর এক পাকিস্তানী ভাইয়ের দাঁতে প্রচণ্ড ব্যথা শুরু হয়। নার্সকে জানালে তাঁকে শুধু একটি টাইলেনল ওষুধ খেতে দেওয়া হয়। ব্যথার তীব্রতা এতই বেশি ছিল যে নির্দিষ্ট ত্রিশ মিনিটের মধ্যে তিনি সেদিন খেয়ে শেষ করতে পারেননি। খাটো করে নীল চোখের এক সেনা সেদিন খালি প্লেটগুলো নিয়ে যেতে এসেছিল। পাকিস্তানী ভাইটি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে তিনি খাবার শেষ করার জন্য আর সামান্য কিছু সময় বাড়তি পাবেন কি না। কিন্তু অসুস্থ মানুষটাকে সেই অনুমতি না দিয়ে সে তাঁকে তাঁবুর সামনে হাঁটিয়ে নিয়ে যায়। এরপর তাঁর যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখে ভয়ানকভাবে মারতে শুরু করে। অসহায় চোখে চেয়ে থাকা ছাড়া আমরা আর কিছুই করতে পারিনি।

এই ঘটনা আমাদের হৃদয়ে এমন দাগ কেটেছিল যে সেদিন রাতের খাবার পরিবেশন করা হলে আমরা একযোগে তা প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। দ্রুত এই খবর অন্যান্য তাঁবুতেও ছড়িয়ে পড়ে। তাঁরাও আমাদের সাথে আন্দোলনে যোগ দেয়। জেলের কমান্ডারকে অনশনের ব্যাপারে জানানো হলে সে আমাদের আন্দোলনের কারণ জিজ্ঞেস করতে চলে আসে। সৈন্যদের দুর্ব্যবহার এবং অত্যাচার সম্পর্কে জানানোর একটা মোক্ষম সুযোগ ছিল সেটা।

তারা পরে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে যদি আমরা অনশন ভাঙি তাহলে পরিস্থিতির উন্নয়নে তারা কাজ করবে এবং এ ধরণের অবমাননা আর হবে না। কিন্তু একটা কিছুর পরিবর্তন যদি হতো! ঠিক পরেরদিনই সকাল সকাল জিজ্ঞাসাবাদের দল এসে তাঁবুতে ঢোকে। আমরাও যথারীতি শেষ প্রান্তে গিয়ে দাঁড়াই। অসুস্থ মোহাম্মদ নওয়াব ভাইয়ের নিজের জায়গা থেকে নড়ার শক্তিটা পর্যন্ত ছিল না। তাই তিনি শুয়ে ছিলেন। ফলে কোনো কথাবার্তা ছাড়াই সৈন্যরা তাঁকে ঘুষি মারতে থাকে। মারতে মারতে তাঁকে তাঁবুর এক প্রান্তে নিয়ে যায় ওরা।

একটা কথা বলে রাখি, আমেরিকান সৈন্যদের মধ্যে একজন ছিল যে এসব অত্যাচারে অংশ নিত না। তবে যদি কখনো তার মনে আমাদের জন্য কোনো দয়া জন্মেও থাকে, সে কোনোদিনও তার সঙ্গীদের নিবৃত্ত করতে এগিয়ে আসেনি।

সে না জেনে কুরআনের অপমান করে ফেলেছিল।

অবশ্য তারা যে কেবল একবার এ কাজ করেছে তা না। একদিন আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। আমার সঙ্গীদের কেউ কুরআন তিলাওয়াত করছিল, কেউ দাবা খেলছিল (এক ইয়েমেনী ভাই বলেছিলেন শাফেয়ী মাজহাব অনুসারে দাবা খেলা জায়েজ)। গভীর ঘুমে ছিলাম আমি, হঠাৎ কারও তীব্র চিৎকার করে কান্নার আওয়াজ শুনতে পাই। আতঙ্কিত হয়ে উঠে বাইরে চলে আসি আমি।

দেখি আমাদের এবং আশপাশের তাঁবুর সবাই কাঁদছে। কী হয়েছে জানতে চাইলাম। সৌদি আরবের ভাই মোহাম্মদ নওয়াব বললেন আমাদের পাকিস্তানী ভাইকে যে সৈন্যটি মেরেছিল সে একটা ব্যারেলের পাশে দাঁড়িয়ে কুরআন শরীফের ওপর প্রস্রাব করেছে। তারপর ঘৃণাভরে কুরআনের কপিটাকে সেই ব্যারেলে ছুঁড়ে ফেলেছে। অথচ ঐ ব্যারেলে বন্দীরা ময়লা ফেলতেন।

কান্দাহারে ঘটেছিল এই ঘটনা। অনেকদিন পর আমেরিকার এক ম্যাগাজিনে লেখা হয় গুয়ান্তানামো বে কারাগারে এটি হয়েছে। মহাপবিত্র কুরআনের এমন অপমান দেখে আমরা রেড ক্রিসেন্টের কাছে পিটিশন করলাম যেন আমাদের সাথে থাকা কুরআনগুলো ওরা সংগ্রহ করে নিয়ে

যায়। যেহেতু আমরা আল্লাহর পবিত্র কথামালার পবিত্রতা রক্ষা করতে পারছিলাম না, তাই সেটাই ছিল সমাধান।

রেড ক্রিসেন্ট আমাদের দাবি মোতাবেক পদক্ষেপ নেয়নি। আমেরিকান কর্তৃপক্ষও ঘটনাটাকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করল। তারা বলল এমন কিছু আর কখনো হবে না। এমনকি এর জন্য ক্ষমা চাওয়ার প্রতিশ্রুতিও দিলো।

কীসের কী? সার্চ করার সময় কুকুরের দল কুরআন খুঁজে বের করত আর ছুঁড়ে ছুঁড়ে বাইরে ফেলা হতো। কর্তৃপক্ষ সৈন্যদের এমন আচরণের ব্যাপারে ছিল সম্পূর্ণ নিশ্চুপ। একই সৈন্যকে একাধিকবার এমন করতে দেখেছি। তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা তো নেওয়া হতোই না বরং পরেরবার সে আরও আগ্রাসী হয়ে ফিরে আসত।

এক রাতে খাবার এবং নামাজ শেষে আমরা হেলিকপ্টারের শব্দ শুনতে পাই। হঠাৎ কয়েকজন সৈন্য এসে ঢোকে এবং পুরো কারাগারের কোণায় কোণায় অস্ত্রধারী সৈন্য নিয়ে মিলিটারি গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ে। একটা আলাদা গাড়ি চালিয়ে আনা হয়, যার ছাদে ক্যামেরা লাগানো ছিল। কী ঘটছিল কিছুই বুঝিনি।

আমাদের উঠে দাঁড়ানোর আদেশ এলো এবং কথা বলতে নিষেধ করা হলো। হাত নিচের দিকে নামিয়ে রাখতে বলল। চোখের কোণা দিয়ে আমরা চারদিক দেখে নিচ্ছিলাম। বামপাশে দেখলাম কয়েকজন বন্দীকে লাইন ধরে এনে মাটিতে শোয়ানো হচ্ছে। ভারী অস্ত্রসজ্জিত, হেলমেট-হাঁটু বন্ধনীসহ পূর্ণ যুদ্ধ-পোশাক পরিহিত একদল সৈন্য তাঁদের দিকে অস্ত্র তাক করে রেখেছিল। ডানদিকে তাকিয়েও একইরকম সৈন্যদল দেখেছিলাম।

হঠাৎ তারা দৌড়ে এসে আমাদের অন্যপাশে হটিয়ে নিয়ে গেল। এরপর আরেকদল এসে আবার আগের জায়গায় নিয়ে গেল। আসলে তাদেরকে তখন বন্দীদের সামলানো এবং শায়েস্তা করার প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছিল। এই পুরো প্রক্রিয়া ভিডিও করা হয়েছিল। যেন তারা তাদের দেশকে দেখাতে পারে কত 'শক্তভাবে' এবং 'কী মহান দেশপ্রেমে' বলীয়ান হয়ে তারা 'সাহস এবং দ্রুততার সাথে' সন্ত্রাসীদের আক্রমণ করে পরাস্ত করছে!!

আমরা তাদের এই খেলার ঘুঁটি ছিলাম মাত্র। মানুষ হিসেবে আমাদের সমস্ত মর্যাদা সেখানে অগ্রাহ্য হয়েছিল আর আমরাও অবাক বিস্ময়ে শুধু দেখে

গেছি জীবন্ত মানুষগুলোর সাথে তারা কত অরুচিকর ভাষায় চিৎকার করে। অপমান করে যায় অনবরত, যার কারণ শুধু তারাই জানে।

আরও কিছু ঘটনা মনে পড়ে। এক রাতে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয়। আমার শিকল এবং হাতকড়া খুলে দেয় ওরা। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করি—আমাকে সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছে ওরা। চা-বিস্কুটও রাখা ছিল টেবিলে। আরও দুজন জিজ্ঞাসাবাদকারী রুমে এসে ঢোকে এবং তারাও আমাকে শুভেচ্ছা জানায়। ১৮০° ঘুরে যাওয়া তাদের আচরণ দেখে আমি কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। ওরা আমার পরিবার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। জানতে চাইল কারাগারের কোনোকিছু সম্পর্কে আমার কোনো অভিযোগ আছে কি না! বাড়ি ফিরে যেতে চাই কি না সেটাও জানতে চাইল ওরা!

এরপর বলল আমার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার কোনো প্রমাণ তারা পায়নি। সুতরাং আমাকে শীঘ্রই ছেড়ে দেবে, এমনটাও জানিয়েছিল। নিশ্চিত করল, ছেড়ে দেওয়ার পর তারাই আমার দেখাশোনার দায়িত্ব নেবে। আমাকে মোটা অঙ্কের অর্থসাহায্য করা হবে, ফোন সংযোগ দেওয়া হবে এবং আরও যা যা চেয়েছি তার সবই পাব আমি। তবে শুধু একটা শর্তে—শায়খ ওসামা বিন লাদেন এবং মোল্লা মোহাম্মদ ওমরকে ধরতে সাহায্য করতে হবে।

কীভাবে একজন মুসলিম তার মতোই আরেকজন মুসলিমের দাম নির্ধারণ করতে পারে? কেমন করে ওরা এ ধরণের বেইমানী চুক্তির কথা ভাবতে পারল?

বিশ্বাসঘাতকতা করার চাইতে আজীবন বন্দী থাকব আমি। সে-ই ভালো। সুতরাং কথার মাঝখানেই তাদেরকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—কী বুঝে ওরা আমাকে গ্রেফতার করেছে। তারা বলল, তারা ভেবেছিল আমি আল-কায়েদা এবং নিউইয়র্ক-ওয়াশিংটনে হামলার ব্যাপারে জানি। এমনকি তালিবান এবং আল কায়েদার সদস্যের সম্পর্কে এবং তাদের টাকার উৎস সম্পর্কেও আমি জানি—এমনটা তারা মনে করেছিল।

কিন্তু তালিবানের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হওয়ার পরও আমি নিউইয়র্ক বা ওয়াশিংটনের ঘটনা সম্পর্কে কিছুই জানতাম না।

"তারমানে আপনারা," আমি বলতে থাকি, "স্বীকার করছেন যে আমি নির্দোষ?"

তারা বলল, দাসানুদাস পাকিস্তানী সরকার আমাকে ধরিয়ে দিয়েছে।

আমি দৃঢ়কণ্ঠে বললাম, "কোনোপ্রকার শর্ত ছাড়াই আমাকে ছেড়ে দিতে হবে।"

টানা তিনদিন যাবৎ আমার ওপর এমন সাইকোলজিকাল গেইম চালিয়ে যায় ওরা। তারা আমার দেশের অর্থনীতি এবং অন্যান্য সেক্টরে সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দিলো। আমাকেও এই জঘন্য কারাগার থেকে আজীবনের জন্য মুক্তি দেওয়ার লোভ দেখাল।

কিন্তু আমি আমার কথায় অনড় থাকলাম। তাদের সাথে কোনোপ্রকার ব্যবসায়ীক চুক্তিতে যেতে রাজি হইনি। সুতরাং যা ভেবেছিলাম তাই হয়েছিল। রেগে গিয়ে আচ্ছামতো বকাবাজি করার পর আমাকে ভয় দেখাল সবরকমের শাস্তি প্রয়োগ করার, আরও কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি করার। আর এর মাধ্যমেই আমার কারাজীবনের নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছিল।

আচমকা সফর

পরদিন সকালে আমরা তাঁবুতে বসে ছিলাম, কয়েকজন সৈন্য হাতকড়া এবং শিকল নিয়ে এসে তাঁবুর সামনে ফেলল। প্রথম তাঁবু থেকে তারা কাজ শুরু করল এবং দশজনকে দড়িতে বেঁধে ফেলল। তারপর তাঁদেরকে জেলের বাইরে নিয়ে গেল।

তাঁদের কী হবে এখন এ নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম। কেউ বলছিল হয়তো তাঁদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে। কেউ বলছিল তাঁদের অন্য কোথাও পাঠানো হবে। পরে অবশ্য দেখলাম তাঁদের ফিরিয়ে আনা হয়েছে। কিন্তু দেখে চেনা যাচ্ছে না একজনকেও। তাঁদের মাথা, ভ্রু, গোঁফ এমনকি দাড়িও চেঁছে ফেলা হয়েছে।

একসময় আমারও ডাক এলো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ অনুযায়ী ইসলামে দাড়ি কাটা হারাম। হানাফী মাজহাব অনুসারে দাড়ি শেভ করা গুনাহ। আমার মনে হলো, দাড়ি না কেটে আমাকে মেরে ফেললে সেটাই বরং ভালো।

নাপিতকে দাড়ি না কাটার কথা বলতেই ভীষণ এক চড় এসে আমার গালে পড়ল। আঘাতটা এত বেশি ছিল যে আমি চোখ খুলতে পারিনি কয়েক মিনিট। ডাক্তার যখন জিজ্ঞেস করেছিল আমার চোখে কিসের ব্যথা, আর আমি বললাম আমাকে যে চড় মেরেছে সেটার ব্যথা, সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা চড় জুটল; অভিযোগ করা যাবে না। এবং দ্বিতীয় চড়টা ডাক্তারই মেরেছিল।

আমরা আর শেভ করা নিয়ে কিছু বললাম না। ইয়েমেনের শায়খ সালিহর দাড়ি ছিল খুবই সুন্দর। তিনি অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন। বলছিলেন যেন আমি না কাঁদি। কারণ এগুলো সবই আল্লাহর ইচ্ছাতেই ঘটছিল।

আমরা বিশ্বাস করি এভাবে অত্যাচারিত হওয়ায় আল্লাহর কাছ থেকে আমরা ভালো প্রতিদান পাব ইনশাআল্লাহ। আমাদের চেহারা বিদঘুটে দেখাচ্ছিল। আমাদের গ্রামের এক খিটখিটে বুড়ির কথা মনে পড়ল। দুষ্টু ছেলেপেলেদের সে অভিশাপ দিত "তোর দাড়ি কেউ কাইটা দিবে একদিন"

বলে। কারণ দাড়ি কাটাকে আমাদের সমাজে খুবই লজ্জাজনক হিসেবে গণ্য করা হয়।

একইভাবে আমাদের সত্ত্বাকে গুঁড়িয়ে দিয়ে আমেরিকানরা আমাদের অপমান করতে চাইল। ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত, যে কাজটা ওরা প্রতিদিন করে নিজেদের স্মার্ট দেখানোর জন্য সে কাজটাই আমাদের ওপর প্রয়োগ করল ঠিক উল্টো কারণে।

ওয়াকিল আহমেদ মুতাওয়াকাইল ছিলেন তালিবান সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। একদিন একজন জিজ্ঞাসাবাদকারী জানতে চাইল আমি ওয়াকিল ভাইকে চিনি কি না। তাঁর ব্যাপারে বিস্তারিত বলতে বলল। শেষে জিজ্ঞেস করল, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই কি না। আমার সন্দেহ হলো, তাঁকেও কি গ্রেফতার করা হয়েছে? আমি জানতে চাইলাম তাঁকে কোথায় রাখা হয়েছে, আমি তাঁর সাথে কথা বলতে পারব কি না।

কিছুক্ষণ পরেই সেই কক্ষে তিনি প্রবেশ করলেন। আমার কোনো ধারণাই নেই কেন ওয়াকিল সাহেবের সাথে আমার আলাপ করানো হয়েছিল। তিনি আমার জন্য পাকিস্তানি বিস্কুট নিয়ে এসেছিলেন। সেগুলো সামনের ডেস্কে রাখলেন। কিন্তু হাত-পা বাঁধা থাকায় আমি সেগুলো খেতে পারিনি, আবার ওগুলো তাঁবুতে নিয়ে যাওয়ার অনুমতিও ছিল না। যাইহোক, তাঁকে ধন্যবাদ জানালাম উপহারের জন্য। প্রায় দশ থেকে পনের মিনিট আমরা কথাবার্তা বললাম, তারপর তিনি চলে গেলেন।

আমাকে তাঁবুতে ফিরিয়ে নেওয়া হলো আবার। কিছুক্ষণ পরই জানতে পারলাম আমাকে শীঘ্রই কিউবায় পাঠিয়ে দেওয়া হবে। আল্লাহই জানেন ওয়াকিল ভাই যখন আমার সাথে কথা বলতে এসেছিলেন, তখন তিনি একথা জানতেন কি না। তবে তিনি এ ব্যাপারে কিছুই বলেননি।

পরদিন আমাকে আবারও জিজ্ঞাসার জন্য নিয়ে যাওয়া হলো। জিজ্ঞাসাবাদকারী আমার সাথে খুবই স্বাভাবিক আচরণ করল এবং জানাল, ১লা জুলাই আমাকে কিউবায় স্থানান্তর করা হবে।

কণ্ঠে খুবই গুরুত্ব ঢেলে সে বলল কিউবায় একবার বন্দী হিসেবে গেলে আজীবন সাগরের মাঝখানের সেই দ্বীপেই কাটাতে হয়। এমনকি মারা গেলে লাশ দেশে পাঠানো হবে কিনা এ বিষয়েও কেউ নিশ্চিত না।

আমাকে বলা হলো তাদের কথায় রাজি হওয়ার এটাই শেষ সুযোগ। হয় শায়খ বিন লাদেন এবং মোল্লা ওমরকে খুঁজে পেতে সাহায্য করতে হবে, নয়তো কিউবায় পঁচে মরতে হবে। জীবনযাপনের সবরকম সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমাকে শেষবারের মতো সে বলল আল-কায়েদা এবং তালিবান সম্পর্কে তথ্য দিয়ে আমেরিকার গোয়েন্দা বিভাগকে সাহায্য করতে।

সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য একদিন সময়ও দিলো। কিন্তু আমি আগপাশ না ভেবে সাথে সাথে কড়া ভাষায় বললাম, "অন্য বন্দীদের চেয়ে আমি কোনো অংশেই বেশি সম্মানিত বা বুদ্ধিমান না। আমার ভাগ্যে আল্লাহ যা রেখেছেন, নির্দ্বিধায় মেনে নেব। একই কথার একই জবাব বারবার দিতে পারব না। আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে কারও সাথে আলাপ করারও কোনো দরকার নেই আমার।"

আমি কোনো অন্যায়ই করতে পারব না। এখন ওদের যা ইচ্ছে হয় করুক।

গুয়ান্তানামোর পথে

২০০২ সাল। পহেলা জুলাই আমাকে আবারও পুরোপুরিভাবে শেভ করানো হলো। সন্ধ্যায় মাগরিবের নামাজ শেষ করেছি মাত্র, এমন সময় কয়েকজন এসে তাঁবুর ভেতরে কতগুলো শিকল ছুঁড়ে মারল। তারা আমাদের শিকল দিয়ে বেঁধে মাথায় সেই জঘন্য কালো ব্যাগ পরিয়ে দিতে লাগল। চার নম্বরে এসে আমার হাত পা বাঁধা হলো, মাথা ঢাকা হলো। প্রতি গ্রুপে সাত-আটজন করে লাইনে দাঁড় করাল আমাদের।

এরপর একটি প্লেনে ওঠানো হলো। কালো ব্যাগ খুলে চোখে লাগানো হলো কালো চশমা। এর ভেতর দিয়েও কিছুই দেখা যায় না, তবে ব্যাগ ঢাকা মুখের চাইতে ভালোভাবে শ্বাস নিতে পারছিলাম। আমাদের কানও বন্ধ করে দিলো যেন কিছু শুনতেও না পাই। নিজেদের নিজেরাই সান্ত্বনা দিলাম এই বলে, ইনশাআল্লাহ সবকিছু সহ্য করে নেওয়ার শক্তি আল্লাহ আমাদের দেবেন। আল্লাহর ওপর সবকিছু সঁপে দিয়ে অজানার পথে যাত্রা শুরু করলাম আমরা।

আরও একবার নগ্ন অবস্থায় ছবি তোলার অপমানজনক অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হলো। আমরা অনেকবার এমন ঘটনার মুখোমুখি হলেও এভাবে ছবি তোলার প্রত্যেকটা ঘটনাই আমাদের এখনও সমান লজ্জা দেয়। সেবার ছবি তোলা শেষে আমাদের লাল কাপড় দেওয়া হয়েছিল। এমনকি জুতাও ছিল লাল।

আমাদের মুখ ঢেকে দেওয়া হয়েছিল। হাত-পা বাঁধা হয়েছিল দুই ধরণের তালা দিয়ে। একে একে আমাদের প্লেনে উঠিয়ে অপেক্ষা করিয়ে রাখা হলো। মেঝেতে শিকলের একটা লাইন ছিল, যার সাথে আমাদের পায়ে লাগানো তালা আটকে দেয়া হয়েছিল। আর ধাতব চেয়ারে বসিয়ে আমাদের হাত বাঁধা ছিল পেছন থেকে। আমরা ওপরে বা সামনে কোথাও নড়তে চড়তে পারছিলাম না। সেবারের যাত্রাটা ছিল সবচেয়ে কষ্টের। প্রত্যেক বন্দীর জন্য দুইজন ভারী অস্ত্রসজ্জিত সৈন্য নিয়ে বিমান আকাশে উড়াল দিলো।

যাত্রাপথটা বেশ শান্তিপূর্ণই ছিল বেশ কিছুক্ষণ। কিন্তু হেরাত প্রদেশের গভর্নর মোল্লা খাইরুল্লাহ খয়েরখাঁ বাঁধা ছিলেন আমার পাশে। তিনি হঠাৎ হাত এবং পায়ের তীব্র ব্যথায় চিৎকার শুরু করেন। সৈন্যরা সেদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপই করল না। আমরাও যে তাঁকে সাহায্য করব বা নিদেনপক্ষে সান্ত্বনাটুকু দেব সে উপায়ও ছিল না। আমারও হাতে অসহ্য ব্যথা বোধ করতে শুরু করেছিলাম। কিন্তু কোনো শব্দ করিনি, জানতাম লাভ নেই। কিছু ভাই মৃত্যুযন্ত্রণার মতো ব্যথায় গোঙাচ্ছিলেন।

যন্ত্রণাকর বিশ ঘণ্টা পর বিমান তার গন্তব্যে পৌঁছল। যাত্রা শুরুর চার ঘণ্টা আগে থেকে আমরা শিকলবদ্ধ হয়ে ছিলাম এবং অবতরণের পর আরও তিন ঘণ্টা পর শিকল খুলে দেওয়া হয়। যার মানে প্রায় ত্রিশ ঘণ্টা কেটেছে আমাদের ঐ অস্বস্তিকর, যন্ত্রণাদায়ক অবস্থায়।

বিমানে আমাদের একটি আপেল আর এক গ্লাস পানি দেওয়া হয়েছিল। আমি ওগুলোর কিছুই ছুঁয়ে দেখিনি। কারণ বাথরুমে যাওয়া মানে ছিল আরেক ঝামেলার ব্যাপার। তাছাড়া এভাবে হাত পা বাঁধা অবস্থায় কিছু খাওয়া বা পান করাও ছিল প্রায় অসম্ভব।

দশ-বারো ঘণ্টার মধ্যেই হাত-পা ফুলে একেবারে অনুভূতিহীন হয়ে পড়েছিল। হাত কেটে হাতকড়া বসে গিয়েছিল। বিমান থেকে আমাদের নামানোর সময় স্টিল থেকে মাংসসহ হাত-পা ছাড়িয়ে আনতে আমেরিকানরা ভালোই ঝামেলায় পড়েছিল।

এরোপ্লেনটি চলার পথে একবার থেমেছিল, আর দ্বিতীয়বার থামল একটি জাহাজের ডেকে। এই জাহাজে করেই আমাদের জায়গামতো নিয়ে যাওয়া হবে। সুতরাং আবারও লাইন ধরে দাঁড় করিয়ে আমাদের শিকল দিয়ে বাঁধা হলো। তারা আরবি এবং পশতু ভাষায় চিৎকার করছিল–নিজ জায়গা থেকে কেউ নড়বে না। কিন্তু এতক্ষণ এক জায়গায় থেকে পুরো শরীর শক্ত হয়ে গিয়েছিল। তাই বাধ্য হয়েই গা এক আধটু নাড়াতে হচ্ছিল আমাদের। আর তা করামাত্রই ধারালো বুটের লাথি এসে জুটছিল ভাগ্যে। আমি নিজেই লাথি খেয়েছি তিনবার।

সমুদ্রযাত্রার শেষে একটি গাড়ি ডেকে এসে দাঁড়াল আমাদের কোনো এক অজানা গন্তব্যে নিয়ে যাবার জন্য। একসময় মাটিতে নামিয়ে আনা হলো

আমাদের। প্রত্যেককে দেওয়া হলো এক গ্লাস পানি, যেহেতু আমরা শুকনো বালির ওপর দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমাদের হাত এবং পায়ের বাড়তি তালাগুলো খুলে দেওয়া হলেও রয়ে গেল হাতকড়া আর পায়ের বেড়ি। সেদিনের পর থেকে প্রায় এক মাস যাবৎ আমার হাত দুটো ফুলে ছিল। আর প্রায় তিন মাস আমি কিছুই অনুভব করতে পারিনি। যেন অসাড় হয়ে পড়েছিলাম, হাত মুঠো করতে বা কবজি নাড়াতে পারতাম না।

যাইহোক, এরপর এক্স-রে এবং অন্যান্য শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আবারও হাত-পায়ে শিকল বেঁধে আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো জিজ্ঞাসাবাদ কক্ষে। কিছুক্ষণ পর একজন ফারসি দোভাষীসহ একজন এসে প্রবেশ করল।

প্রশ্নকারী কথা শুরু করল, "কেমন আছেন? আমি টম।"

সে বলল, তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আমার ব্যাপারে তদন্ত করার জন্য। একই প্রশ্ন, একই উত্তরে ততদিনে আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি। তাছাড়া সেসময় শারীরিকভাবেও ছিলাম খুব ক্লান্ত। তাই কোনো কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। বললাম, "পরে কথা বলব। এখন কোথায় বন্দী করে রাখবে রাখো আমাকে।"

টম জোর গলায় বলল সে প্রশ্ন করার সাথে সাথেই আমাকে জবাব দিতে হবে। আমি ছিলাম বিধ্বস্ত, মুখ ছিল শুকনো এবং আমি আসলেই চাচ্ছিলাম কোনো কথা না বলতে। আমাকে গ্রেফতার করার পর থেকেই ওরা আমাকে কিউবার ভয় দেখিয়ে আসছে যেন আমেরিকার 'শত্রু'দের ব্যাপারে আমি কিছুটা হলেও ছাড় দেই। এখন আমি কিউবাতে আছি, সুতরাং ভয় দেখানোর মতো আর কিছু নেই। এত বেশি, এত ভয়ানক অত্যাচার এই কয়দিন সহ্য করে এসেছি যে, এখন আর কোনো কিছুতেই কিছু যায়-আসে না। মরতেও আর ভয় পাই না আমরা; বরং কখনো কখনো মরে যাওয়াই ভালো বলে মনে হয়।

তার সাথে কথা বলতে আবারও অস্বীকার করলাম।

টম কথা বলার জন্য জোরাজুরি করল, কিন্তু আমি চুপচাপ বসে থাকলাম। শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে সে রুম ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

কয়েকজন সৈন্য এসে আমাকে ছোট একটা কারাকক্ষে নিয়ে গেল। হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিলো এবং এক ব্যাগ খাবার দিয়ে গেল। সবচেয়ে বেশি খুশি হলাম পানি দেখে। অজু করা নিয়ে এখন আর চিন্তা নেই! গত পাঁচটা মাস আমি একবারও ঠিকভাবে পবিত্র হতে পারিনি। অত্যন্ত খুশিমনে আমি তখনই নামাজের প্রস্তুতি শুরু করলাম।

বেশ কিছুক্ষণ ঘুমানোর পর কয়েকজন ভাইয়ের উঁচু গলায় কথা বলার শব্দে জেগে উঠলাম। রাতটা তাঁদের কাছে অনেক বড় মনে হচ্ছিল। কেউ বলছিলেন এ এলাকায় সূর্য ওঠে না, কেউ বলছিলেন এখানে একেকটি রাত আঠারো ঘণ্টা লম্বা হয়।

সে রাতে বেশ ভালো ঘুম হলো। সেদিন তাহাজ্জুদ পড়তে উঠিনি, কিন্তু ফজরের সময় জাগতে পেরেছিলাম। এত বেশি পরিশ্রান্ত ছিলাম সেদিন যদি কোনো সৈন্য এসে উঠতে বলত তাহলেও উঠতে পারতাম না। এমনকি ঘুমানোর জায়গার এত বিরাট পরিবর্তন সত্ত্বেও লম্বা ঘুম দিতে পেরেছিলাম। ইশরাকের নামাজ শেষে আমরা একজন অন্যজনকে আমাদের যাত্রাপথের অভিজ্ঞতা জানাচ্ছিলাম।

আমি যে খাঁচার মতো কারাকক্ষে ছিলাম সেটা ছিল একটি কন্টেইনারের মতো বিল্ডিংয়ে। এর নাম ছিল আনবার ব্লক। কারাগারের এই অংশে কথা বলায় কোনো বাধা ছিল না। কান্দাহার বা বাগরামের চেয়ে বেশ ভালো সৈন্যদের পেয়েছিলাম পাহারায়। নিজেদের কিছুটা স্বাধীন মনে হতো, তবে একাকীত্বের বোধও হতো একই সাথে। যার যার ছোট ছোট কারাকক্ষে আমরা ছিলাম নিঃসঙ্গ।

কারাকক্ষগুলো দৈর্ঘ্যে ছিল ছয় ফুট আর এদের প্রস্থে ছিল চার ফুট। একটির পরে একটি খাঁচার মতো কারাকক্ষ। কক্ষের ভেতরে, মেঝেতে ছিল একটি ধাতব বিছানা আর ছিল একটি পানির ট্যাপ এবং কমোড। একই রুমে থাকা, খাওয়া, ঘুমানো, গোসল-টয়লেট করা, নামাজ পড়া সবই করতে হতো। কারাকক্ষগুলোর মাঝে কেবল একটি তারের জালি দিয়ে আলাদা করা ছিল। ফলে আমাদের টয়লেট ব্যবহারে খুবই কুণ্ঠাবোধ হতো।

বিমানে আমার সাথে সাতজন আফগান ভাই ছিলেন। বাকি সবাই ছিলেন আরব। তাঁদের মাঝে ছিলেন খাইরুল্লাহ খয়েরখাঁ, হাজী ওয়ালী

মুহাম্মদ শরাফ, মৌলভী আবদুর রাহীম মুসলিম দুস্ত, বদরুজ্জামান এবং রাসগাইন খাইরুল্লাহ। বাকি দুই আফগান ভাইয়ের নাম আমি ভুলে গেছি। খাইরুল্লাহ ভাই একবার বলেছিলেন, যখন তাঁকে কারাকক্ষে নিয়ে আসা হয় তখন হাত ছিল বাঁধা। তিনি ভেবেছিলেন এবার তাঁর হাত দুটো দরজার সাথে আটকে রাখা হবে। কিন্তু যখন সত্যি সত্যি তাঁর হাত খুলে দেওয়া হলো, তিনি তখন ভেবেছিলেন এখানে তাহলে সাময়িকভাবে রাখা হচ্ছে।

আমাদের থাকার জায়গা কিছু বিভ্রান্তির জন্ম দিয়েছিল। আরব ভাইরা বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না যে আমরা কিউবায় আছি। কারণ এখানকার আবহাওয়া অনেকটা আরব উপদ্বীপের মতোই ছিল। ফলে আমরা যখন পূর্ব দিকে ফিরে নামাজ আদায় করতাম, তাঁরা আদায় করতেন পশ্চিমে ফিরে।

মুসলিমরা আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে ক্বিবলার দিকে ফিরে নামাজ আদায় করে। খালিদ জাহরানী ছিলেন অন্যতম আরব যিনি আমাদের নতুন জায়গার অবস্থান নিয়ে দ্বিধায় ছিলেন।

আরব ভাইয়েরা আমেরিকানদের প্রতিটি কথাতেই সন্দেহ পোষণ করতেন। কেউ কেউ আবার ভাবতেন এসব সৈন্য মূলত আমেরিকান সেজে থাকা আরব। তারা আমাদের কথাবার্তা শুনে অন্যদের জানানোর জন্য গুপ্তচরবৃত্তি করছে। ফলে তাঁরা নিজেরা কথা বলার সময় থাকতেন বাড়তি সতর্ক। আর যখন তাঁরা শুনলেন সৈন্যদের কেউ দুই একটা আরবীও বলছে, তখন তাঁদের সন্দেহের আগুনে যেন ঘি এসে পড়েছিল।

প্রহরীদের সম্পর্কে

ওখানকার গার্ডদের তিনভাগে ভাগ করা হতো। এই বিভাজন ছিল তাদের পোশাকে লাগানো বিভিন্ন রকমের মিলিটারি ব্যাজ অনুসারে। কারও ব্যাজ ছিল গাছের, কারও ছিল ক্রস, অন্যদের ব্যাজ ছিল অনেকটা চাঁদের মতো। যাদের ব্যাজ ছিল গাছের মতো তারাই ছিল সবচাইতে নম্র এবং তারাই বন্দীদের সব প্রয়োজন, সুযোগ-সুবিধার খেয়াল রাখত। তারা কখনোই বৈষম্য করত না। আমাদের সময়মতো খাবার দেওয়া হতো। খাবারও থাকত যথেষ্ট, আর সাথে থাকত তাজা ফল। রাতের বেলাও তারা আমাদের বিরক্ত করত না। অযথাই সার্চ করার কাজ তারা করেনি।

কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তারা খোঁজখবর নিত, প্রয়োজনে ডাক্তার ডেকে আনত। দোভাষীদের বলত রোগীদের বা বন্দীদের সাহায্য করতে। হাঁটার জন্য এবং গোসল করার জন্য আমরা যথেষ্ট সময় পেতাম। এরা আমাদের নামে কখনোই কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট বা অভিযোগ করেনি। কখনো শাস্তি দেয়নি আমাদের। আমাদের পোশাক পরিবর্তনেও তারা সাহায্য করত। যদি কখনো ভুলক্রমে ছেঁড়া বা পুরাতন কাপড় দেওয়া হতো, তাহলে ওরা সেগুলো পাল্টে নিয়ে আসত। কারাকক্ষ থেকে আমাদের বের করার সময় বেশ যত্নের সাথে ওরা শেকলের তালা বা হাতকড়া খুলে দিত। তাদের এমন ভালো ব্যবহার আমাদের মুগ্ধ করেছে।

আমরা আমাদের সাথি বন্দীদের উৎসাহিত করতাম এই গ্রুপের সৈন্যদের ব্যাপারে কোনো অভিযোগ না করতে। এই গার্ডরা আমাদের সাথে ভালো আচরণ করত, আমরাও ইসলামের শিক্ষানুসারে তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করতাম।

ক্রস চিহ্নধারী প্রহরীরা ছিল নিয়ম-নীতির ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর। যদিও তারা আমাদের অধিকার নিয়ে সচেতন ছিল, তবু প্রায়ই আমরা বৈষম্যের শিকার হতাম এবং খাবার বিলি করার সময় কখনো-কখনো প্রতারিত হতাম। এই দলের সৈন্যরা খুবই বকাঝকা করত। অবশ্য তাদের

মাঝেও কেউ কেউ ছিল যারা বেশ ভালো ছিল এবং আমাদের সাথে শ্রদ্ধা রেখে আচরণ করত।

আর চাঁদের চিহ্ন লাগানো সৈন্যরা ছিল সবচাইতে বেশি পক্ষপাতী। আমাদের খাবার বা কাপড় দেওয়ার সময় ওরা খুব কৃপণতা করত। ঘুমের মাঝেও হঠাৎ এসে বাগড়া বাধাত। প্রায় সারাদিনই ওরা আমাদের ওপর চিৎকার চেঁচামেচি করত। কিন্তু এদেরও কয়েকজন ভালো ছিল।

এই দলগুলো ছাড়াও আরও তিনটি দল ছিল। তাদের আলাদা করা যেত একটা চাবির চিহ্ন দেখে বা ৯৪ নম্বর লেখা দেখে। আর অন্য দলটি ছিল আসফালিনো (The Asphalino)।

আসফালিনো দলের সদস্যরা ছিল নম্র এবং সহানুভূতিশীল। তারা আমাদেরকে তাদের গল্প শোনাত। তাদের অতীতের গল্প, যা গিয়ে তাদের মুসলিম পূর্বপুরুষদের কাহিনীতে পৌঁছাত। তারাও আমাদের বাড়তি খাবারের চালান দিত, সাবান-শ্যাম্পু দিয়ে যেত, নগ্ন বন্দীদের সামনে আড়াল হয়ে দাঁড়াত। তারা কখনো আমাদের রাতের ঘুমে ব্যাঘাত ঘটায়নি। আমাদের ধর্মীয় রীতির প্রতিও তারা ছিল শ্রদ্ধাশীল। নামাজের সময় কোনোদিন ওরা এসে বিরক্ত করেনি কিংবা কুরআনের প্রতিও কখনো অসম্মান দেখায়নি। তাদের সাথে বিশ্ব পরিস্থিতি এবং রাজনীতি নিয়েও কথা বলতাম আমরা, এমনকি বাইরের বিশ্বের খবরাখবরও কিছু কিছু তাদের কাছ থেকে জেনে নিতাম।

যেমনটা ভেবেছিলাম, তাই হয়েছিলো–আসফালিনো সৈন্যদের অল্পদিন বাদেই অন্যত্র বদলি করে দেওয়া হলো। বন্দীদের সাথে তাদের এত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক দেখে আমেরিকানরা সন্দেহ করতে শুরু করেছিল।

চাবির ব্যাজওয়ালা প্রহরীরা ছিল একেকটা বন্য পশু। তারাই গুয়ান্তানামোতে সবচেয়ে বেশি দিন কাটানো দল। এমনকি আমাকে যখন ছেড়ে দেওয়া হয়, তারা তখনও ছিল সেখানে। তাদের কথাবার্তা ছিল খুবই কর্কশ এবং আমাদের সালাতকে সবসময় অসম্মান করত। আর ওরা লেগেই থাকত আমাদের সাথে ঝামেলা পাকানোর তালে।

তারা প্রায়ই নিজেরা সমস্যা সৃষ্টি করে আবার আমাদের নামে কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করত। ফলে কিছু হতভাগা বন্দীকে অযথাই

বকাঝকা, গালাগালি শুনতে হতো, কঠিন শাস্তি পেতে হতো। এসব সৈন্য অনবরত মিথ্যা অভিযোগ করত, কথায় কথায় মিথ্যা বলত। অবমাননা করত পবিত্র কুরআনের আর সুযোগ পেলেই বন্দীদের মারধোর করত।

তারা আমাদের ঘুমে ব্যাঘাত ঘটানোর জন্য অহর্নিশ কারাকক্ষের সামনে দিয়ে ভারী বুট পরে টহল দিত। মাঝরাতে টর্চের আলো ফেলত আর উদ্দেশ্যহীন সার্চিং চালাত শুধুই আমাদের বিরক্ত করার জন্য। গভীর রাতে প্রায়ই ভারী স্টিলের দরজা খুলত, লাগাত। লাঠি দিয়ে বাড়ি দিত দরজাগুলোতে আর এদের ক্যাঁচক্যাঁচ, ঝনঝন শব্দে আমাদের ঘুম যেত ভেঙে।

৯৪ গ্রুপ ছিল আরও আগ্রাসী। তাদের কাজই যেন ছিল আমাদের প্রহার করা। বন্দীদের তারা সবসময় নিচু চোখে দেখত। কেউ অসুস্থ হলেও তাদের কাছ থেকে কোনো গুরুত্ব পেত না। নামাজের সময় ইচ্ছে করে বারবার বিরক্ত করাও ছিল তাদের আরেক বদভ্যাস। কুরআন নিয়ে তারা মর্যাদাহানিকর কথাবার্তা বলত। সব মিলিয়ে বন্দীরা এই দলটাকেই ভয় পেতেন সবচাইতে বেশি।

এদের কথাই সবচেয়ে বেশি অমান্য করতেন বন্দীরা। তাদের সাথে কথা বলতে চাইতেন না, প্রশ্নের জবাব দিতেন না। তাদের গায়ে পানি ছুঁড়ে মারতেন। এমনকি হাঁটার সময়ে এরা থাকলে হাঁটতেও বেরুতেন না।

বন্দীরা এই গ্রুপের সৈন্যদের সার্চও করতে দিতে চাইতেন না। তাঁরা চিৎকারের জবাব চিৎকার করেই দিতে শিখে গিয়েছিলেন। সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যত বেশি সম্ভব বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে যেন এই সৈন্যদের ব্যাপারে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। কয়েক মাস জুড়ে চলেছিল এই প্রতিরোধ। শেষ পর্যন্ত গ্রুপ ৯৪ বাতিল করা হয়। তবে কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এই গ্রুপের সদস্যরাই অন্যান্য গ্রুপে ভাগ হয়ে কাজ করতে শুরু করে আগের মতো। আমরা ঠিক নিশ্চিত না, তবে আমাদের ধারণা ছিল যে এই অমানুষগুলো সম্ভবত ইসরায়েল থেকে এসেছে। আল্লাহই ভালো জানেন।

ছয় মাস পরপর গার্ডদের বদল করা হতো। প্রতিবারই কেউ না কেউ থাকত যাদের আচার ব্যবহার ভালো ছিল। কিন্তু সবসময় এমন কিছু লোক

থাকত যাদের লক্ষ্যই ছিল আমাদের অপমান করা। অনেক গার্ডই আমরা কোন অবস্থায় আছি তা বুঝত না। অনেকে আবার সহানুভূতিশীল ছিল, বলত এরকম দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। প্রতিজ্ঞা করেছিল অন্যায় এ কারাগারের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক মিডিয়ার নজর নিয়ে আসবে। একবার এক বয়স্ক প্রহরীকে দেখছিলাম এক বন্দীর ওপর করা অত্যাচার দেখে সে কাঁদছে। যখন তার সাথে কথা বলার সুযোগ হয়েছিল; বলছিল, এই অমানবিকতা বন্ধ করার ক্ষমতা তার নেই।

গার্ডরা বিভিন্ন জাতিসত্তা থেকে এসেছিল। তাদের মাঝে সাদা যেমন ছিল, ছিল বাদামী এবং কালো লোকও। আর মজার ব্যাপার হলো, জাতিগত পরিচয়ের ভিত্তিতে তাদের মধ্যে সম্মানের মাত্রা ওঠানামা করত। ক্ষমতা এবং নিয়ন্ত্রণ বেশিরভাগই থাকত সাদাদের হাতে। বাকিরা নিতান্তই পদাতিক বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এমনকি কখনো কখনো মিশ্র জাতের প্রহরীদের সাথে তো বন্দীদের মতো আচরণ করা হতো। দেখে তাদের প্রতিই আমাদের করুণা জন্মাত।

কালো সৈন্যরা প্রায়ই কম শিক্ষিত হতো এবং দেখা যেত তারা অন্যান্য দরিদ্র দেশ থেকে এসেছে। তাদের আচরণও ছিল দাসের মতো। সমাজের বৈষম্যের জন্য সাদাদের গালমন্দ করত। তারা মাঝেমধ্যে আমাদেরও বলত কীভাবে সাদারা একের পর এক জমি দখল করে কালোদের জেলের বাইরেই বন্দী করে রেখেছে, জেলের ভেতরে তো চাকরি দিয়ে চাকর বানিয়ে রেখেছেই। ওরাও সাদাদের আতঙ্কে থাকত। ক্ষণে ক্ষণে চারপাশে তাকাত কেউ তাদের ওপর গোয়েন্দাগিরি করছে কি না দেখার জন্য।

ওরা বলত—সাদারা দেশের সব ক্ষমতা হাতে নিয়ে বসে আছে এবং গদিতে বসে মুখে সব মানুষের জন্য খুব দরদ মাখা কথাবার্তা বললেও আসলে সব মিথ্যে। কারাগারে সাদারা সবসময় অন্যদের ব্যাপারে খবরদারী করে বেড়ায়। এমনকি কখনো কখনো পদমর্যাদায় নিচে অবস্থান করা সৈন্যও তার ওপরের কারো ওপর গোয়েন্দাগিরি খাটায়, শুধু সাদা হওয়ার গৌরবে।

আমরাও দেখেছি বেশিরভাগ জিজ্ঞাসাবাদকারী থাকত সাদা। এবং তারা শিক্ষিতও হতো।

এছাড়া আমরা জেনেছি স্থানীয় আমেরিকানরা কেমন ছিল এবং কীভাবে ইউরোপ থেকে আসা সাদারা ওদেরকে হটিয়ে দিয়ে নিজেরা ভোগদখল করছে। জানলাম তাদের অনেকেই পড়াশুনা তেমন একটা করে না এবং মাদকেও আসক্ত হয়ে গেছে। জেনেছি কীভাবে হাজার হাজার লোককে ওরা হত্যা করেছে এবং বাকিদের পুনর্বাসনের নামে কেমন দুর্বিষহ অবস্থায় ফেলে দিয়েছে। কালোদের ওরা একটা সীমায় আবদ্ধ করে ফেলেছে এবং আমেরিকার সংসদে অল্প কয়টা আসন দিয়ে রেখেছে। এরপরও ওরা নিজেদের সমঅধিকার রক্ষাকারী বলে দাবি করে।

কালো প্রহরীদের কাছ থেকে এগুলো আমরা শুনেছি। সাদাদের নিয়ে ওদের অন্তরে ছিল ব্যাপক ঘৃণা, তারা সুযোগ পেলে সেটা প্রকাশও করত। তারা মনে করত সাদারা তাদের জন্য, এমনকি পুরো বিশ্বের জন্যই ক্ষতিকর। তারা আমাদের অবস্থা বুঝত, দয়া দেখাত এবং যখনই কোনো দরকার পড়ত, তাদের সাধ্যমতো সাহায্য করত।

প্রথম ক্যাম্প

যখন আমাদের গুয়ান্তানামো কারাগারে আনা হয়, তখন সেখানে কেবল একটিই ক্যাম্প ছিল। সেই ক্যাম্পে ছিল ৮টি ব্লক আর ছিল ৪৮টি কারাকক্ষ বিশিষ্ট আলাদা এক নির্জন কারাবাস। মাঝেমাঝে হাঁটার জন্য ছিল দুটি জায়গা আর অজু করার জন্য একেবারেই সাধারণ মানের ৪টি অজুখানা। আলাদা নির্জন কারাগারে কবরের মতো ২৪টি কক্ষ আয়তনে অন্যান্য কারাকক্ষগুলোর মতোই। তবে সেগুলো ছয়দিক থেকেই ছিল নিরেট ধাতুতে গড়া। ঘনকের মতো কক্ষগুলোর পেছনে ছয় বাই বারো ইঞ্চির ছোট্ট এক জানালা ছিল, যা দিয়ে তাকালে চোখে পড়ত তারকাটা দিয়ে ঘেরা এক বিষণ্ণ খোলা জায়গা। কক্ষের দরজায় খুবই ছোট এক গর্ত রাখা হয়েছিল, যেটা শুধুমাত্র খাবার দেওয়ার সময়ই খোলা হতো।

প্রথম ক্যাম্পের গার্ডরা ছিল ভীষণ মারকুটে। খাবারও পাওয়া যেত প্রয়োজনের তুলনায় খুব অল্প। একে অন্যের সাথে কথা বলার অনুমতি ছিল না। যদি কখনো অন্য ব্লকের কারও সাথে কথা বলতে গিয়ে ধরা পড়ে যেতাম, তাহলে এর চড়া শোধ নেওয়া হতো। বন্দীদের পরতে হতো শক্ত, অমসৃণ উপাদানে তৈরী লাল পোশাক, থাকত না কোনো অন্তর্বাস। ফলে অনেকের চামড়ায়ই ভয়ানক দাগ পড়ে গিয়েছিল, কারও হয়েছিল অসহ্য চুলকানি।

প্রত্যেক বন্দীর জন্য বরাদ্দ থাকত দুটি কম্বল, দুটি পানির বালতি, একটি পানির বোতল, দুটি তোয়ালে, একটি ছোট প্লাস্টিক ম্যাট, একটি টুথব্রাশ, টুথপেস্ট, এক কপি পবিত্র কুরআন এবং একটি মাস্ক। কাউকে শাস্তি দেওয়ার সময় সেই প্লাস্টিক ম্যাটটি ছাড়া বাকি সবকিছু নিয়ে যাওয়া হতো।

দ্বিতীয় ক্যাম্প নির্মাণ শেষ হলে পরিস্থিতি একদম পাল্টে যায়। সিনিয়র অফিসার হিসেবে যে জেনারেল ছিল তাকে বদলি করা হয় এবং নতুন অফিসারের নিয়মকানুন হয়ে দাঁড়ায় অনেক কঠোর।

বন্দীদের বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ভাগ করে দেয় ওরা আর বাড়িয়ে দেয় অত্যাচারের মাত্রা। নির্জন কারাগারের সংখ্যা বাড়িয়ে তিনশ-তে উন্নীত করে। ধর্মীয় বই বাজেয়াপ্ত করে, দাড়ি শেভ করার অপমানজনক প্রক্রিয়া আবারও শুরু করে ওরা। জিজ্ঞাসাবাদের সময় শারীরিক নির্যাতনের পরিমাণও বেড়ে যায় অনেকগুণ, মিলিটারিরা রুমের তাপমাত্রা হঠাৎ অত্যন্ত বাড়িয়ে দিত। কখনো আবার তা নামিয়ে দিত অনেক নিচে। এছাড়া ঘুমে ব্যাঘাত ঘটানো, আবদ্ধ জায়গায় আটকে রেখে অনবরত হট্টগোলের শব্দ করে এবং ওয়াটার-বোর্ডিং করেও তারা অবর্ণনীয় অত্যাচার চালাত।

মোল্লা আবদুল গফুর বন্দী ছিলেন আমার পাশের কক্ষে। তাঁর অধিকাংশ সময়ই কেটেছে নির্জন কারাবাসে। আমেরিকানদের প্রতি তাঁর ঘৃণা দিনে দিনে কেবল বেড়েছে। তিনি বলতেন, ওদের অমানবিকতা ক্ষমার অযোগ্য। কোনো সৈন্যের সাথেই তিনি কথা বলতে চাইতেন না। প্রায়ই নিজের গলার কাছে হাত দেখিয়ে সৈন্যদের ইশারা করতেন যে, তিনি ওদের মেরে ফেলবেন। সবসময়ই প্রতিশোধ নেওয়ার কথা বলতেন তিনি।

আমি তাঁকে এমন করতে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু কারও কথা শোনার পাত্র তিনি ছিলেন না। গ্রেফতার এবং পরবর্তী অত্যাচারের কারণে তিনি বেশ ভুগছিলেন। পরে জানতে পেরেছি তিনি শহীদ হয়ে গিয়েছেন।

মোল্লা শাহজাদা, যাঁর প্রকৃত নাম ছিল ইউসুফ, তিনিও সৈন্যদের ঘৃণা করতেন। শহীদ করা হয় তাঁকেও।

আমেরিকানদের অত্যাচারের মাত্রা কখনো কখনো এত বেশি তীব্র হয়ে পড়ত যে, আমাদের সবার মনেই ভীষণ ক্ষোভ এবং ঘৃণা জন্মাতে শুরু করে। ফলে সবচেয়ে নির্বিবাদী মানুষটাও একসময় তাদের চরম শত্রুতে পরিণত হতে বাধ্য হয়।

ক্যাম্প ইকো

দ্বিতীয় জেনারেল বব গার্নার অত্যাচারের নিত্যনতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করত। এছাড়া সে সৈন্যদেরও অনুমতি দিয়ে রেখেছিল আমাদের সাথে যা খুশি তা করার জন্য। বব গার্নারকে পরবর্তীতে ইরাকেও পাঠানো হয়।

বব ক্যাম্প ইকো গড়ে তোলে। অত্যন্ত জনশূন্য এবং অন্ধকার এক ক্যাম্প। নির্জন কারাবাসের জন্য এতে ছিল একেবারে আলাদা একটি ভবন। সেখানে একটি আলাদা রুম ছিল যার ভেতরে ছিল একটি খাঁচার মতো জায়গা। বন্দীকে দুই দরজার ভেতরে আটকে রাখা হতো এবং দূর থেকে সব নিয়ন্ত্রণ করা হতো। সবকিছু তদারকির জন্য সার্বক্ষণিক ভিডিও ক্যামেরা চালু থাকত। বন্দী ভেতর থেকে কিছুই শুনতে বা দেখতে পেতেন না। দিন রাতের পার্থক্য করা যেত না। সময়ের হিসেব রাখাই সেখানে দীর্ঘ যন্ত্রণাদায়ক দুঃস্বপ্নে পরিণত হতো।

যে ভাইয়েরা এমন দুর্ভেদ্য দেয়ালের মাঝে দিন কাটিয়ে ফিরতেন, তাঁদের প্রায়শই স্মৃতিভ্রম হতো। ভুগতেন অন্যান্য মানসিক সমস্যায়ও। ইংল্যান্ড থেকে পাকিস্তানে ইসলাম সম্পর্কে পড়াশুনা করতে এসেছিলেন আহমাদ নামের এক ভাই। পাকিস্তানি এবং আমেরিকান বাউন্টি হান্টারদের খপ্পরে পড়ে একসময় তাঁর স্থান হয় কিউবায়। কান্দাহারেও তিনি আমার পাশের কারাগারে ছিলেন। তখন এক টন ওজনের ধাতব শিকল সবসময় তাঁর গলার চারপাশে ঝুলত। ফলে একসময় তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। শুধু তাই না, একদিন তিনি জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তাঁকে অনবরত অত্যাচার করা হয়।

এমনই নাজুক পরিস্থিতিতে তাঁকে কিউবা পাঠানো হয়। এখানে এসে তাঁর অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়ে। যখন তিনি নির্জন কারাবাস থেকে ছাড়া পান, তখন তাঁর জায়গা হয় আমার পাশে ছোট এক খাঁচার মতো কারাকক্ষে। প্রায় রাতেই শুনতাম বিকারগ্রস্ত আহমাদ ভাই কুরআন তিলাওয়াত করছেন বা আরবি নাশীদ গাইছেন। কখনো কখনো ভুল উচ্চারণে। তিনি অভিশাপ দিয়ে দিয়ে অত্যাচারকারীদের প্রতিশোধ নেওয়ার

প্রতিজ্ঞা করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন এবং জোরে জোরে বলতেন, ইমাম মাহদী খুব শীঘ্রই চলে আসবেন। সম্ভবত এর মাধ্যমে তিনি নিজেকে বুঝ দিতেন যে তাঁর এই দুর্ভোগের অবসান কোনো অলৌকিক সাহায্যের মাধ্যমে হবে। এক সৈন্যকে খাবারের প্লেট দিয়ে আঘাত করার পর তাঁকে ইকো ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। দীর্ঘ তিন বছর তিনি এই দুঃসহ যন্ত্রণা সয়ে গেছেন।

ক্যাম্প ইকোর ডিজাইন করার সময় আমেরিকানরা যতটা সম্ভব বিবেকহীন হয়েছে। দুই রুমের মাঝে সরু যে খাঁচার মতো গারদ ছিল, তার ভেতর থেকে কিছুই শোনা বা দেখা যেত না। একজন বন্দীর সেখানে হাঁটারও কোনো উপায় ছিল না। এমনকি সে যদি গলা ফাটিয়ে চিৎকারও করে, তবু তার শব্দ এতটুকুও বাইরে যাবে না। ভিডিও ক্যামেরার মাধ্যমে ২৪ ঘণ্টা একজন বন্দীর ওপর নজরদারী করা হতো। যদি কোনো বন্দীর কোনোকিছু দরকার পড়ত তাকে ক্যামেরার সামনে এসে বারবার হাত নাড়াতে হতো কোনো গার্ডের নজরে পড়ার জন্য।

বইপত্র দূরে থাকুক, নোটবুকও রাখার অনুমতি ছিল না। চার দেয়ালের মাঝে আটক ব্যক্তিকে সবরকমভাবেই বন্দীত্বের শেকল পরানো হতো সেখানে। দিনের পর দিন এমন জনমানবের সংস্পর্শহীন থাকলে যে কারওই মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটতে বাধ্য। এর সাথে আছে নাছোড়বান্দা জিজ্ঞাসাবাদ এবং নির্যাতন, আর আছে কেন এতকিছু হচ্ছে- এর কোনো উত্তরই খুঁজে বের করতে না পারার মানসিক চাপ। সবকিছু মিলিয়ে কারও পাগল হয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু না।

মেধাবী, শিক্ষিত আহমাদও মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছেন একই কারণে। যখন তিনি ধীরে ধীরে এমন অবস্থায় পৌঁছাচ্ছিলেন, তখন গার্ডরা কোনোরকম চিকিৎসার ব্যবস্থা না নিয়ে আগের মতোই অত্যাচার চালিয়ে গেছে। তারিক আবদুর রহমান এবং ড. আইমানের ভাগ্যেও একই পরিণতি জুটেছে।

ইসলামে অসুস্থদের জন্য আছে ক্ষমা এবং দয়ার বিধান। কিন্তু এই আমেরিকানদের না বিবেক বলতে কিছু ছিল, না তারা আল্লাহকে সামান্য ভয় পেত।

ক্যাম্প ডেল্টা

সময়ে সময়ে আমাদের কোনো কারণ বা ব্যাখ্যা ছাড়াই এ ব্লক থেকে ও ব্লকে স্থানান্তরিত করা হতো। আমিও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কারাগারে আটক থেকেছি ঐ দুই বছরে। কখনো ডেল্টা ব্লকের ১৫ নম্বরে, কখনো গোল্ড ব্লকের ৮ নম্বরে এরপর আবার একই ব্লকের ১৫ নম্বরে।

অনেকদিন পর আমাকে সরিয়ে নেওয়া হয় Q ব্লকে। প্রথমে সেখানে আমার স্থান হয়েছিল ৩০ নম্বরে, এরপর সাত নম্বর কারাগারে। Q ব্লক আমার কাছে কিছুটা অন্যরকম লাগল কারণ সেখান থেকে আমরা সমুদ্র, আর তাতে জাহাজ দেখতে পেতাম। অল্প কিছুদিন বাদেই আমাকে অন্য আরেক সেলে সরিয়ে দেওয়া হয়, যেখানে বেশ অনেকদিন ছিলাম। এগুলো ছিল অন্য ক্যাম্পগুলো থেকে একেবারে আলাদা কোথাও। পাঁচ মাস কাটিয়েছি ওখানে। এখানেই আমার সবচেয়ে কঠিন সময় কেটেছে কারণ, যে রুমে আমি ছিলাম সেটি ছিল বড় আরেকটি রুমের ভেতর। আর ঐ বড় রুমটি নিজেই ছিল আরও বড় এক ব্লকের মাঝে। সুতরাং আমরা ছিলাম একদম একা, সার্বক্ষণিক নজরবন্দী।

শুরুতে তিন শিফটে আমাদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করা হতো, পরে তা দুইয়ে নেমে আসে। সপ্তাহে একদিন আমরা গোসল করতে পারতাম এবং পনেরো মিনিট হাতে চেইন পরা অবস্থায় বাইরে হাঁটতে পারতাম। পরে গোসলের দিন বাড়িয়ে সপ্তাহে দুইদিন করা হয়, হাঁটার সময়ও করা হয় আধঘণ্টা। সপ্তাহে একদিন আমাদের কাপড় পাল্টাতে দিত, কিন্তু কোনো নেইল কাটার বা শেভ করার মতো কিছু ছিল না। পরে অবশ্য এগুলোও দেওয়া হয়।

শুরুর দিকে সৈন্যরা সবুজ বক্সে করে মিলিটারিদের জন্য অনেক আগে প্যাক করে রাখা রেশনের খাবারই আমাদের সরবরাহ করত। পরে সকাল এবং রাতের খাবার হিসেবে রান্না করা খাবার দিতে শুরু করে। কয়েক বছর পর দুপুরেও রান্না করা খাবার দেওয়া শুরু হয়। সরবরাহকৃত খাবারের কোনো সীমা ছিল না এবং গার্ডদের ওপর আমরা কতখানি নির্ভরশীল বা

প্রতিজন বন্দীর জন্য কতটুকু খাবার বরাদ্দ আছে, সেরকম কিছুও সেখানে কার্যকর ছিল না। ওয়ানটাইম প্লাস্টিকের প্লেটে করে আমাদের খাবার দেওয়া হতো। কিন্তু অনেক ভাই-ই সন্দেহ করতেন যে এই প্লেটগুলো আগেও ব্যবহার করা হয়েছে, সুতরাং এগুলো অস্বাস্থ্যকর। তাই তাঁরা খাওয়া শেষে প্লেটগুলো ভেঙে দিতেন যেন আর কেউ ব্যবহার না করতে পারে। সকালে আমাদের এক গ্লাস পানি আর ঠাণ্ডা চা দেওয়া হতো। পরে তার পরিবর্তে গরম চা দেওয়া শুরু হয়।

খাবারের মধ্যে থাকত মুরগী, গরুর মাংস, মাছ আর সবজি যেমন ঢেঁড়স, শিম, পালংশাক আর আলু। মাঝেমাঝে থাকত ডিম, কৃত্রিম ভাত এবং বিভিন্ন রকমের রুটি। যদিও মনে হচ্ছে খাবারদাবারে ভালোই ভিন্নতা ছিল, কিন্তু খাবারগুলোই ছিল বিস্বাদ বা স্বাদহীন। যেনতেনভাবে সেদ্ধ করেই ওগুলো পরিবেশন করা হতো। মাংস চিবুনো যেত না, খেলে হজমে সমস্যা হতো। মাছের কটু গন্ধে পুরো ব্লক ভরে যেত। মুরগীর রক্তভরা শিরা না ফেলেই রান্না করে ফেলত, ভাত যা দিত তাতে পেটও ভরত না।

তাজা ফল দেওয়া হতো দিনে তিনবার, তা ছিল আমাদের জন্য বিরাট এক সুবিধা। দিনে এক গ্লাস দুধও আমাদের জন্য বেশ ভালো ছিল। তবে সব মিলে প্রতিদিন যে পরিমাণ খাবার দেওয়া হতো, একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের সাধারণত এর পাঁচগুণ খাবারের প্রয়োজন হয়।

কারাগারের ভেতরেই আমরা নামাজ পড়তাম। আজান দেওয়ার অনুমতিও ছিল, কিন্তু প্রায়ই গার্ডরা চিৎকার করে আজানের বাক্যগুলো বলে হাসাহাসি করত। প্রথমে আমরা নিজেদের কারাকক্ষে একা একাই নামাজ পড়তাম, কিন্তু পরে ফিকহ জানা ব্যক্তিদের উদ্যোগে জামাতে নামাজ শুরু হয়, যখন জানা গেল জামাতে নামাজের অনুমতি আছে। খাঁচাগুলোর মধ্যে যেটা সবার আগে, সেখানের ভাইয়েরা ইমাম হতেন। কোনো কোনো ভাই বিশ্বাস করতেন নামাজের কাতার ঠিকমতো না হলে জামাত আদায় হয় না। তাই তাঁরা নিজেরা নিজেরা নামাজ পড়ে নিতেন। তাহাজ্জুদের জন্যও ডাকা হতো, কিন্তু নির্জন কারাগারে যাঁরা ছিলেন তাঁদের জন্য সময়ের হিসেব বের করা ছিল অত্যন্ত কঠিন।

অনেক বন্দীই আজান শুনতে পেতেন না। কিন্তু সময় না জানলেও, আজান না শুনলেও প্রত্যেকেই তাঁদের প্রতিদিনকার পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে নিতেন। প্রতিটি খাঁচায় একটি করে ছোট মাইক ছিল যেন জরুরি মুহূর্তে বার্তা পাঠানো যায়। কিন্তু আমরা মাইকগুলো ব্যবহার করতাম–হয়তো অন্যায়ভাবেই–আজানের বাক্য ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য। কারণ যাঁরা আজান দিতেন তাঁরা প্রায়ই সময়ের হিসেবে ভুল করে বসতেন। যেহেতু তাঁরা সূর্যের দেখা পেতেন না, তাই কখনো ফজরের আজান হতো বেলা গড়ানোর অনেক পরে, আবার মাগরিবের আজান হয়ে যেত বিকেল বেলায়ই। কিন্তু আমরা যেহেতু জানতাম সূর্যের অবস্থান সম্পর্কে তাই আমরা মাইক ব্যবহার করেই আজান দিতাম।

আমাদের জায়গা যখন আবারও বদলে দেওয়া হলো, তখন আমি ফিরে এলাম কিউবিক ক্যাম্পে। আমার দেখা সবচেয়ে জঘন্য কারাগার সেটি। কেবল একটা অন্তর্বাস পরিয়ে আমাদের বসিয়ে রাখা হতো। ঘুমাতেও হতো ওভাবে, অর্ধনগ্ন হয়ে, বসে বসে। কি শীত, কি গ্রীষ্ম সবসময় একই অবস্থা। শীতে শরীর গরম রাখার জন্য নিজের জায়গায় বসে বসে লাফানো ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। নামাজের সময় বা অন্যদের সামনে নিজেকে ঢেকে রাখার পর্যাপ্ত কাপড় ছিল না। খাবার ছিল প্রয়োজনের তুলনায় ভীষণ অপ্রতুল। সার্বক্ষণিক আমাদের হেনস্থা করা হতো, মারধর করা হতো।

টয়লেটের চারপাশে কোনো ঘেরাও ছিল না। ফলে দুর্গন্ধ ছড়াত সবসময়, আর তাই আমাদের দেওয়া স্বল্প পরিমাণ খাবার খেতেও বমি আসত। অত্যাচারের মাত্রা বাড়াতে কোনো পানি বা টিস্যু পেপারও দেওয়া হতো না। একই হাত দিয়ে নিজেদের পরিষ্কার করতে, সেই হাতেই খাবার খেতে আমরা বাধ্য হয়েছিলাম।

নিজেদের স্বাধীনতা এবং সাম্যের ধারক-বাহক বলা এই জাতিটা কতটা মিথ্যাবাদী ও বর্বর হলে নিরপরাধ, নিরীহ মানুষকে এভাবে অত্যাচার করতে পারে! তাদের সাথে পশুর মতো আচরণ করতে পারে!

এ ধরণের শাস্তি সাধারণত এক মাস দীর্ঘ হতো, কারও কারও ক্ষেত্রে তা পাঁচ মাসেও উন্নীত হতো। কোনো কোনো ভাই অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতেন, ফলে তাঁদের শাস্তির মেয়াদও যেত বেড়ে।

মানসিক রোগীদের জন্য আলাদা একটি ব্লক খোলা হয়েছিল। যাঁদের অবস্থা বেশি খারাপ এবং আত্মহত্যাপ্রবণ তাঁদের চিকিৎসায় আলাদা ডাক্তার নিযুক্ত ছিল। প্রতিদিনই দুই-তিনজন আত্মহত্যার চেষ্টা করতেন। তাঁদের আলাদা ইনজেকশনের মাধ্যমে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হতো। ফলে অনেকেই পরবর্তীতে ঐসব ওষুধে আসক্ত হয়ে পড়েন।

এমন কঠিন পরিস্থিতিতে থাকলে যে কারও মাথাই কয়েকদিনে খারাপ হয়ে যাবে। সন্দেহপ্রবণতা বেড়ে যাবে। আমাদের ওখানেও তাই হলো। বন্দীরা একে অন্যকে দোষ দিতে শুরু করলেন তাঁদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা লেলিয়ে দেওয়ার অভিযোগ এনে। কখনো কখনো সবাই মিলে একজনকে সন্দেহ করতেন এবং যাঁকে সন্দেহের তালিকায় ফেলতেন তাঁর কাছ থেকে আলাদা থাকতেন। কেউ তাঁর সাথে কথাও বলতেন না। তাঁদের বিরুদ্ধে জ্বালাময় বক্তৃতা দিতেন কেউ কেউ। সৈন্যরা যখন অন্যদের মারধোর করত, তখন তাঁদের দোষারোপ করা হতো যে সৈন্যরা তাঁদের কাছ থেকেই তথ্য নিয়েছে। ফলে ঐসব ভাইয়েরা আরও বেশি বিমর্ষ হয়ে পড়তেন, তাঁদের মানসিক সমস্যা দেখা দিত অনেক বেশি। শেষমেশ তাঁদের স্থান হতো সাইকিয়াট্রিক ক্যাম্পে।

এঁদের কেউ কেউ ছিলেন আফগানী। ফিদা এবং সরদার ভ্রাতৃদ্বয় ছিলেন পাকতিয়া প্রদেশের জুরমাত গ্রামের অধিবাসী। আবার কেউ এসেছিলেন কোনার প্রদেশ থেকে। কিছুদিন পর এই লোকেরা নিজেদের ইসলাম থেকে মুক্ত ঘোষণা করেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে কটূক্তি করতে শুরু করেন। এমনকি তাঁরা কুরআনকেও অসম্মান করতে চেয়েছিলেন যতক্ষণ না সেগুলোকে তাঁদের কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। পরে অবশ্য আনোয়ার ভাই বলেছেন, তিনি ঐ সমস্ত পাপের জন্য তওবা করেছেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

এঁদের দলে কয়েকজন ইরাকীও ছিলেন–আলী, শাকির, আরকান, মোহাম্মদ এবং আরও একজন যাঁদের নাম আমি ভুলে গেছি। আবু সোরদাহ নামের একজন ইয়েমেনীয় এবং সিরিয়ার আবদুর রহিমও ইসলাম ত্যাগ করা লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

তবে কয়েকজন বন্দী আসলেই ছিল বেশ সন্দেহজনক। তাদের আশপাশে আমরা কেউ ভিড়তে চাইতাম না। তাদের যদি আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়া হতো তাহলে আমরা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায় করতাম। এরা আমাদের আশপাশে থাকলেই আমরা সতর্ক থাকতাম যেন আমাদের কোনো কথা বা আচরণ তাদের মাধ্যমে আমেরিকানদের কানে না যায়।

আর সবসময় যেটা হয়, তাই হলো এখানেও। এই দোসরদের তাদের পৃষ্ঠপোষকরাও আর পছন্দ করত না। এরা নিজেদের খ্রিষ্টান প্রমাণ করার জন্য গলায় ক্রুশ ঝুলিয়ে রাখলেও ডেল্টা ক্যাম্পে এদের ওপর প্রচুর অত্যাচার চলত। এদের দলে এত বেশি লোক ভিড়ে গিয়েছিল যে আমাদের মনে হচ্ছিল এখানে এমন কিছু করা হচ্ছে যাতে আমরা সবাই ইসলামচ্যুত হয়ে যাই।

ক্যাম্প ফোর এবং ফাইভ

আমাদের ক্যাম্প ফোর এবং ফাইভের কথাও বলা হয়েছিল। এগুলোর একটি অন্যটির চেয়ে ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। ক্যাম্প ফোর ছিল তুলনামূলক স্বস্তিকর এবং কিছু সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন। কিন্তু ক্যাম্প ফাইভ অবস্থানই ছিল অন্য সমস্ত ক্যাম্পের চেয়ে অনেক দূরে। আর জিজ্ঞাসাবাদকারীরাও আমাদের সেখানকার অবস্থা এবং শাস্তি সম্পর্কে বলে ভয় দেখত। তারা বলত, এই ক্যাম্পের মতো ভয়াবহ ক্যাম্প আর হয় না।

২০০৩ সালের জুলাই মাসে সত্তর জন বন্দীকে নিয়ে যাওয়া হয়। আমরা কেউ জানতাম না তাঁদেরকে কেন এবং কোথায় নিয়ে গিয়েছে। সৈন্যদের মধ্যে একজন ছিল, যে আমাকে মাঝেমাঝে গোপনে কিছু তথ্য দিত সেও মুখ বন্ধ রাখল। তবে একদিন সে আমার দিকে তার হাতের পাঁচ আঙুল তুলে ধরে ইশারা করল, যাতে আমরা বুঝে নিলাম সেই ভাইদের ক্যাম্প ফাইভে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

কয়েকমাস সেই জঘন্য জায়গায় কাটানোর পর কয়েকজন বন্দী ফিরে এলেন। তাঁরা ছিলেন–ওরোজগান প্রদেশের তারিনকোট গ্রামের মোল্লা ফজল, পাকতিয়া প্রদেশের জুমরাত জেলার মোহাম্মাদ ক্বাসাম, নানগ্রারহর প্রদেশের জালালাবাদ থেকে আসা মুয়াল্লিম ফরিদ এবং আউয়াল গুল, এবং মোহাম্মদ দাউদ, মোহাম্মদ নবী আর আবদুল করীম ছিলেন খোস্ত প্রদেশের অধিবাসী। ফজলে রুহুল্লাহ ছিলেন কোনার প্রদেশের, ইজ্জতুল্লাহ এসেছেন কাবপিসিয়া প্রদেশ থেকে, কালাতের সাজ্বী জেলা থেকে এসেছেন আবদুল হালিম নূর, আর গজনী থেকে এসেছেন মুয়াল্লিম মুহাম্মদ জহির এবং মোহাম্মদ নবী, মোহাম্মদ জাওয়াদ, মোহাম্মদ ক্বাসাম, মুয়াল্লিম আউয়াল গুল, গুল শাহ ওয়ালী, আবদুর রাজ্জিক, আবদুল জলিল আর আবদুল করীম ইজ্জতুল্লাহ। এঁরা ক্যাম্প ফাইভে একবছর কাটানোর পর মুক্তি পান। যখন আমি জেল থেকে ছাড়া পাই, তখন তাঁদেরকে আবার আগের ক্যাম্পে ফিরিয়ে নেওয়া

হয়। আমি যখন চলে আসি তখন সব মিলে আটজন ক্যাম্প ফাইভে বন্দী ছিলেন।

ধৈর্য, স্থিতি এবং আল্লাহর ওপর গভীর বিশ্বাস এই লোকগুলোকে ঐ ভয়ানক জায়গায় থাকা সহ্য করিয়েছে। ওখানে রুমগুলো এত ছোট যে দাঁড়ানোর মতো জায়গা পর্যন্ত নেই। চারদিকে ঘনআকৃতির কংক্রিটের দেয়াল–যার ভেতরে বাতাস বা সূর্যের আলো প্রবেশের কোনো সুযোগই নেই। ঘুমানোর জায়গাটাও পুরোটাই সিমেন্টের, আর একটাই দরজা যেটা দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ করে খোলা-বন্ধ করা হয়। বন্দীদের হাত-পা সবসময় শেকল দিয়ে বাঁধা থাকত, শুধু খাবার বা ওষুধ খাওয়ার সময় তা খুলে দেওয়া হতো। মানুষগুলো ঐ ভয়াবহ পরিস্থিতি সামলেছেন শুধুমাত্র কুরআনের আয়াত থেকে সান্ত্বনা নিয়ে। আল্লাহ তাঁদের সবার মঙ্গল করুন।

ছোট একটা ছিদ্র দিয়ে খাবার নেওয়া এবং যে খাবার দিতে আসে তার কড়া ধমক খেয়ে পেছন ফিরে দাঁড়ানো, এগুলো চরম অপমানকর। আর এমন অবস্থায় দাঁড়িয়ে খাবারের প্লেট নেওয়াও ছিল বেশ ঝামেলার। কখনো হাত থেকে প্লেট পড়ে যেত। যার মানে, বেচারা যেটুকু খাবার পায় সেটাকেও চোখের সামনে মেঝেতে গড়াগড়ি করতে দেখে মাঝেমধ্যে। নোংরা মেঝে ঘষে খাবার তুলে নেওয়ার মানে নিজের শুচিবোধকে বিসর্জন দেওয়া। কিন্তু ক্ষুধার তাড়নায় সেটা করতেই হতো। কারণ কারও জন্যই তো আর বাড়তি খাবারের ব্যবস্থা নেই। সপ্তাহে একদিন হাঁটার বা অসুস্থ হলে চিকিৎসা সেবা পাওয়ার সুযোগও নির্ভর করত প্রহরীদের মর্জির ওপর। না হয় শত অনুরোধেও কাজ হতো না, অসুস্থদের কোনো চিকিৎসার ব্যবস্থাও করা হতো না।

মোল্লা ফজল তাঁর গ্যাস্ট্রিকের সমস্যার কথা জানিয়ে এক বছর যাবৎ চিকিৎসার আবেদন করে এসেছেন। কিন্তু কোনো উদ্যোগই নেওয়া হয়নি। শেষপর্যন্ত তিনি অনশনে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। এতেও ওদের মন গলেনি, বরং তারা অপেক্ষা করেছে তাঁর অজ্ঞান হয়ে পড়ার। ১৬ দিন অনশনের পর ফজল ভাই জ্ঞান হারালে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

তিনি আমাকে বলেছেন, সিনিয়র অফিসার তাঁকে খাবার খেতে বলেছিল, কিন্তু খাবারের আগে তাঁর দরকার ছিল ওষুধের। পরে সেই

অফিসার তাঁকে সুচিকিৎসা করানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তবে এসব প্রতিশ্রুতি ছিল সব ফাঁকা বুলি। এগুলো বিশ্বাস করে কাজ নেই।

যখনই কোনো বন্দীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হতো তাঁর চোখ বেঁধে ফেলা হতো, কান ঢেকে দেওয়া হতো, মুখে পরানো হতো মাস্ক। হাত-পা পেছন দিকে নিয়ে শেকল দিয়ে বাঁধা হতো। যে ভাইয়েরা ক্যাম্প ফাইভে এক মেয়াদ হলেও কাটিয়ে আসতেন তাঁদের আর চেনা যেত না। কঙ্কালের মতো হাড্ডিসার, ফ্যাকাশে চামড়ার মানুষগুলোকে দেখলে কেমন একটা ভয় ভয় লাগত।

আরবের এক ভাইয়ের নাম আবু হারিস। তিনি কারাগারে আমার প্রতিবেশী ছিলেন। ক্যাম্প ফাইভ থেকে ফেরার পর আমি আর তাঁকে চিনতে পারছিলাম না। অনেক চেষ্টা করেছি তাঁর আগের চেহারার সাথে তখনকার চেহারার সামান্য মিল হলেও খুঁজে পেতে। পাইনি। বরং তাঁকে দেখলে কেমন আতঙ্কের একটা অনুভূতি জাগত মনে। এমনকি স্বপ্নেও তাঁকে দেখে চিৎকার দিয়ে জেগে উঠেছি কয়েকবার।

আল্লাহ আমার সমস্ত ভাইকে এই দুনিয়াবি জাহান্নাম থেকে উদ্ধার করুন। তাঁদের সুস্বাস্থ্য ফিরিয়ে দিন এবং পাষণ্ড ও নির্দয় আমেরিকানদের হাত থেকে মুক্তি দিন।

ক্যাম্প ফোর

চতুর্থ ক্যাম্প বা ক্যাম্প ফোর ছিল মুক্তি পেতে যাওয়া বন্দীদের ছেড়ে দেবার আগে ভ্রমণকারীদের যাত্রাবিরতির মতো একটা বিরতি দেওয়ার স্থান। এখানে বন্দীদের সাথে ভালো আচরণ করা হতো, হারানো স্বাস্থ্য ফিরে পাওয়ার জন্য ভালোভাবে খাওয়ানো হতো এবং ঠিকঠাক দেখানোর জন্য যা যা দরকার সবই করা হতো।

এখানে ২০০ জন বন্দীকে রাখার মতো ব্যবস্থা ছিল এবং সবার জন্য সবরকম সুযোগ-সুবিধাই বরাদ্দ ছিল। এই ক্যাম্পে পাঁচটি ব্লক ছিল যার প্রতিটিতেই ছিল চারটি বড় বড় রুম। সেখানে একটি লাউঞ্জও ছিল। আর ছিল গোসলখানা এবং টয়লেট। প্রতিটা বড় রুম দশজন থাকার মতো করে তৈরি করা হয়েছিল এবং সেগুলোতে নামাজ পড়ার জন্য আলাদা জায়গা ছিল। ছিল হাঁটার জায়গা এবং ডাইনিংরুম, যেখানে একসাথে বিশজন বসে খেতে পারবে। হালকা খেলাধুলা, জামাতে নামাজ পড়া এবং দৌড়ানোর বিশাল ট্র্যাক সবকিছুর জন্যই আলাদা জায়গা ছিল। সপ্তাহে একদিন সবাই একসাথে মিলিত হওয়ার এবং চাইলে সিনেমা দেখার সুযোগও ছিল। বন্দীরা দিনে যতবার খুশি গোসল করতে পারতেন, কেউ কিছু বলত না।

পড়াশোনা করার সুযোগও ছিল ঐ ক্যাম্পে, কিন্তু আমরা বই নিয়ে যেতে পারতাম না। আর খাবারের সাথে বাড়তি খেজুর, মধু, কেক এমনকি টমেটো সসও দেওয়া হতো। অথচ অন্য ক্যাম্পের ভাইয়েরা সামান্য খাবারের জন্যও কত কষ্ট করতেন!

পাঁচটি ব্লকের প্রতিটির মাঝে ছিল বিশাল ব্যবধান। ব্লকগুলোর অধিবাসীরা দিনে ত্রিশ মিনিট বাইরে হাঁটার সুযোগ পেতেন। এছাড়া ছোট একটি মাঠে ফুটবল, ভলিবল, টেবিল টেনিস খেলার এবং জগিং করার জায়গা ছিল। এখানে আমাদের পোশাক ছিল সাদা। একটি ভেস্ট, তার নিচে

একটি শার্ট আর ট্রাউজার্স। এগুলো নিয়মিত ধোয়ার জন্য সাবানও দেওয়া হতো।

এদিকে এই ক্যাম্প ফোরকেই ওরা বিশ্বের সামনে তুলে ধরত। সাংবাদিক, সাংসদ, দর্শনার্থীরা এলে এখানেই ঘুরে দেখত, ছবি তুলে নিয়ে যেত। অথচ আমরা কারও সাথে কথা বলার সুযোগ পেতাম না। বলতে পারতাম না অন্য ক্যাম্পগুলোতে আমাদের ভাইয়েরা কী অবস্থায় আছেন।

যখন কোনো বন্দীকে এই ক্যাম্পে নিয়ে আসা হতো, সবাই ধরে নিত তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হবে। তাঁকে বলাও হতো মুক্তি পাওয়ার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিতে। আমেরিকানরা আমাদের বলত এখানে কাউকেই একমাসের বেশি থাকতে হবে না। কিন্তু এক মাস গড়াতে গড়াতে বছরে গিয়ে পড়ত।

আফগান 'প্রতিনিধি' দল

একবার আমাকে কিউ ক্যাম্প (Q camp) থেকে সরিয়ে আলাদা কারাগারে এনে রাখা হয়। তখন এক সৈন্য এসে বলে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তৈরি হয়ে নিতে। এরপর আমাকে এমন এক জায়গায় নিয়ে যাওয়া হলো যেখানে আগে কখনো যাইনি। রুমের মাঝে চাকতির সাথে আমার হাত বেঁধে দেওয়া হলো। জিজ্ঞাসাকারীদের জন্য অপেক্ষা করতে করতেই টের পেলাম কয়েকজন আফগান এসে প্রবেশ করল। সালাম দিয়ে আমার চারপাশে চেয়ারে বসল।

ওরা নিজেদের পরিচয় দিলো আফগান সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে। ওখানের দুইজন ছিল পশতু আর বাকিরা এসেছে পাঞ্জেশেরী থেকে। এক গ্লাস পানি এনে সামনে রাখা হলো।

একটু পর ওরা প্রশ্ন করতে শুরু করল। সেই একই প্রশ্ন যা এতদিন ধরে আমেরিকানরা করে এসেছে।

এক আমেরিকান মহিলা একটু পরপর রুমে এসে ওদের কানে কানে কিছু বলে যাচ্ছিল বা ডেস্কে ছোট চিরকুট রেখে যাচ্ছিল। আমার সন্দেহ হলো, এরা কি আসলেই আফগান সরকারের প্রতিনিধি?

সন্দেহ করলাম, তারা হয়তো দোভাষী, কিংবা যদি এরা সরকারের প্রতিনিধিও হয় তাহলে আমার সাথে প্রতারণা করছে এবং তথ্য দেওয়ার জন্য প্ররোচিত করতে চাইছে। আলোচনা চলছিল এবং আমি জিজ্ঞেস করেই ফেললাম–আপনাদের এখানে আসার উদ্দেশ্য কী।

- আপনারা কেন এসেছেন আসলে?

তারা বলল, তারা আমাদের মুক্ত করতে চায়।

আমি বললাম, শুনতে তো বেশ ভালোই লাগছে, কিন্তু যেভাবে আপনারা কথা বলছেন তাতে মনে হচ্ছে যেন আমি কোনো আমেরিকান জিজ্ঞাসাকারীর সাথেই কথা বলছি। আপনারা আমাকে ছাড়িয়ে নিতে এসেছেন বলে একেবারেই মনে হচ্ছে না। তারা জবাবে কিছুই বলল না।

আমি কখনো বিশ্বাস করিনি যে তারা আমার দেশের প্রতিনিধি। আর তাদের প্রতি কারাগারের অন্যান্য ভাইদের সন্দেহের মাত্রা তো ছিল আরও বেশি। ফলে প্রশ্ন করার সময় এরা প্রায়ই ভাইদের গালি খেয়েছে।

'প্রতিনিধি' দলটা সম্ভবত বুঝতে পেরেছিল বন্দীদের বোকা বানানো যায়নি। তাই এরপর থেকে ওরা আরও বেশি সতর্কতার সাথে কথা বলতে শুরু করে।

আমাদের হৃদয় ব্যাকুল ছিল আমাদের পরিবারের খবর পাওয়ার জন্য, দেশের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে জানার জন্য। কিছু ব্যক্তিগত ব্যাপারেও কথা বলতে চাইতাম দলটির সাথে। কিন্তু ওদের পরিকল্পনা ছিল ভিন্ন। তাই তারা বারবার সেই একই প্রশ্ন করে যেত, আমাদেরকেও জোর করত যেন আমরা কেবল সেগুলোর উত্তরই দিই। এক্ষেত্রে তারা আমেরিকানদেরও ছাড়িয়ে যেত কখনো কখনো।

তাদেরকে ঠিকভাবে সবকিছু জানিয়ে আনেনি আমেরিকানরা। ফলে তারা বিভিন্ন সমস্যার মুখে পড়েছে, হতাশও হয়েছে ক্ষেত্রবিশেষ। তারা যদি এরপরও বন্দীদের তখনকার অবস্থার ব্যাপারে তদন্ত করত, নিপীড়নের খোঁজখবর নিত তাহলে সেটাই তাদের জন্য ভালো হতো। আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় সবকিছু জানিয়ে গুয়ান্তানামোর আসল চেহারা বিশ্বের সামনে খুলে দিতে পারত। তা না করে ওরা আমাদের নিয়ে খোঁটাখুঁটি করতেই বেশি আগ্রহী ছিল।

আফগান ভাই হিসেবে তারা আমাদের জন্য উপহার নিয়ে আসার কথা ছিল, আমাদের প্রতি সহমর্মিতা দেখিয়ে মানসিক সাহস যুগিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। শীঘ্রই ছেড়ে দেওয়া হবে বলে আমাদেরকে উজ্জীবিত করতে পারত। কিন্তু যা বুঝলাম, তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আমাদের ইচ্ছেমতো অপমান করে হলেও কথা বের করে আমেরিকানদের জানানো। অবশ্য আল্লাহই ভালো জানেন।

ছেড়ে দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমাদের এখানে নিয়ে আসা হয়েছিল, তার পরিবর্তে আমাকে আবারও প্রথম ক্যাম্পে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। এরপর আবারও চতুর্থ ক্যাম্পে ফিরে আসি ২০০৪ সালের জুনে। ছাড়া পাওয়ার আগ পর্যন্ত এক বছর এবং কয়েক মাস ছিলাম ওখানে। মাঝে প্রথম ক্যাম্পে একুশ দিন এবং এক, দুই এবং তিন নম্বর ক্যাম্পে আরও সাতদিন করে বন্দী অবস্থায় কাটাতে হয়েছে।

যেমন দেখেছি গুয়ান্তানামো

সেখানে অনেক অনেক অবিশ্বাস্য, অবিস্মরণীয় জিনিস দেখেছি। ক্যাম্প ওয়ান, টু এবং থ্রি-তে প্রচুর ভীতিজনক কর্মকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী হয়েছি। সেসব অন্যায় বিশ্বের যেকোনো জায়গার যেকোনো মানবিক আইনের পরিপন্থী।

২০০৩ সালের রমজানের দুইদিন আগে কয়েকজন আমেরিকান আমাদের বলেছিল, আমাদের বিশেষ ধরণের রুটি দেওয়া হবে পুরো মাস জুড়ে, রোজার মাসকে সম্মান জানিয়ে। সকালের নাস্তার সময় আমরা জানতে পারলাম আমরা পাঁচটি করে খেজুর এবং ছোট এক ক্যান মধুও পাব। খাবারের পরিমাণ খুব সামান্য হলেও এ সংবাদও আমাদের খুশি করল।

যাইহোক, রমজানের দ্বিতীয় দিন আমাদের তাঁবুর শেষপ্রান্তে তিনজন বন্দী এবং একজন প্রহরীর মাঝে একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে যায়। একজন বন্দী গার্ডদের দিকে পানি ছুঁড়ে মারেন। তাঁকে তৎক্ষণাৎ নির্জন কারাবাসে পাঠানো হয়। সেই তাঁবুতে আমরা ছিলাম ৪৮ জন। সেদিনই ব্লকের সবার ওপর খাবারের শাস্তি নেমে আসে। রান্না করা গরম খাবারের পরিবর্তে চৌত্রিশ দিনের জন্য বরাদ্দ করা হয় মিলিটারি রেশনের বস্তাবন্দী খাবার। বন্ধ করে দেওয়া হয় পানির সরবরাহও।

আকস্মিক এই ঘটনায় আমরা সবাই বিহ্বল হয়ে পড়লাম। সিনিয়র গার্ডদের ডেকে বললাম তারা যেন পবিত্র মাসটাকে একটু সম্মান দেখায়। জিজ্ঞেস করলাম মাত্র একজনের জন্য কেন বাকি ৪৭জন শাস্তি পাবে। আরও যোগ করলাম যে খাবার বন্ধ করে দেওয়ার শাস্তি এই প্রথম ঘটেছে তাও আবার রমজান মাসেই! কারণ জানতে চাইলাম আমরা।

কিন্তু তারা কোনো কথারই সদুত্তর দিতে পারেনি। বলল মিলিটারি আইন সবার ওপর পতিত হয়–যা ছিল একেবারে নির্জলা মিথ্যা। কিন্তু কারওই সাহস হলো না এ নিয়ে তর্ক করার।

একবার এক নারী প্রহরী আমাদের খাঁচার মতো কারাকক্ষে সার্চ করতে এসে কুরআনের অপমান করে বসে। পরপর দুইবার পবিত্র গ্রন্থ মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে। বন্দীরা সিনিয়র অফিসারদের কাছে অভিযোগ করে এবং বলে ঐ মহিলাকে তার আচরণের জন্য শায়েস্তা করতে। পরে আমরা সবাই অনশনে নামলাম। ক্যাম্প ওয়ান থেকে শুরু হওয়া এই আন্দোলন শীঘ্রই ক্যাম্প টু এবং থ্রি-তেও ছড়িয়ে পড়ে। বন্দীরা সিদ্ধান্ত নিলেন তাঁরা আর পোশাক পাল্টাবেন না, গোসল করবেন না, হাঁটতে বেরুবেন না। প্রত্যেকেই সৈন্যদের আদেশ অমান্য করতে শুরু করলেন।

আন্দোলন সফল হলো, কিন্তু আমাদের ওপর নেমে এল চরম বিপর্যয়। ওদের স্পেশাল ফোর্সেস টিম এসে ক্যাম্পের ব্লকগুলোতে ভিডিও ক্যামেরা নিয়ে সবকিছুর ছবি তুলে নিতে লাগল। গ্যাস ছেড়ে বন্দীদের দুর্বল করে তাঁদের টেনে হিঁচড়ে কারাকক্ষের বাইরে নিয়ে আসতে লাগল। তাঁদের দাড়ি-গোঁফ, চুল, ভ্রু সবকিছু শেইভ করে দিলো। সবশেষে নির্জন কারাগারে ঠাঁই হলো সবার, যেখানে শোয়ার জন্য একটা চাদরও নেই।

যখন কাউকে টেনে বের করা হচ্ছিল অন্যরা সবাই মিলে চিৎকার করে প্রতিবাদ জানাচ্ছিল। আর এই ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খলা, চিৎকার-চেঁচামেচির ফলে আমরা নিজেরাই অসুস্থ বোধ করতে শুরু করেছিলাম।

আমাদের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিতে নাপিতরা এক অভিনব কৌশল বেছে নিল। ওরা মুখের এক পাশের দাড়ি চেঁছে দিয়ে অন্যপাশ রেখে দিলো কিংবা এক ভ্রু কামিয়ে অন্যটা ছেড়ে দিলো।

আরেকবার গভীর রাতে আমরা 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি শুনে জেগে উঠলাম। 'ইন্ডিয়ান' নামে অনেক দূরে স্থাপিত এক নির্জন কারাগার থেকে ভেসে আসা শব্দটা ক্রমশ বাড়ছিল। বন্দীরা চিৎকার করে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানাচ্ছিলেন। যার যার খাঁচার লোহার শিকে বাড়ি দিয়ে ঝনঝন শব্দ তৈরি করছিলেন। পরে আমরা জানতে পারি, সৈন্যরা নির্দয়ভাবে মারতে মারতে সৌদি আরবের এক ভাইকে শহীদ করে দিয়েছে।

বন্দীরা মাশাল ভাইয়ের কী হয়েছে তা জানতে চাচ্ছিলেন। হুমকি দিচ্ছিলেন চিৎকার করে জায়গাটাকে নরক বানিয়ে ফেলার। বলছিলেন তাঁদের সাথি ভাইয়ের কী অবস্থা তা না জানালে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে

যে, গার্ডরা তা আর সামলাতে পারবে না। তাঁরা মাশাল ভাইকে যেন আল্লাহ শহীদ হিসেবে কবুল করে নেন, তাঁর ক্ষমার জন্য দুআ করতে লাগলেন।

কারাগারের পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে পড়লে গার্ডরা ভারী অস্ত্র এবং ধাতব বর্মে সজ্জিত হয়ে আসে। মাশাল ভাইকে নির্জন কারাবাসের যেখানে অত্যাচার করা হয়েছিল তার চারপাশ লাল রংয়ের বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলা হলো এবং সেখানে লাল লাইট জ্বালিয়ে রাখা হলো। ফলে আমরা বিশ্বাস করতে শুরু করলাম যে, আমাদের ভাইকে মেরে ফেলা হয়েছে। তবে সেদিনই সন্ধ্যায় উর্দু, পশতু এবং আরবি ভাষায় ঘোষণা দিয়ে বলা হচ্ছিল মাশাল ভাইয়ের শারীরিক অবস্থা খুবই খারাপ। যেন আমরা তাঁর জন্য দুআ করি।

এই সংবাদ কিছুটা স্বস্তিদায়ক হলেও বন্দীরা নিজ চোখে তাঁকে দেখে সত্যতা যাচাইয়ের দাবি করতে লাগলেন। পরে তাঁদের মধ্য থেকে একজনকে অনুমতি দেওয়া হলো। তিনি এসে জানালেন মাশাল ভাইকে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

দুই মাস পর আমরা জানতে পারি তিনি প্যারালাইজড হয়ে গিয়েছেন। একজন সুস্থ সবল মানুষকে এভাবে চিরতরে পঙ্গু করে দেওয়াটা তো যেকোনো আইনেরই পরিপন্থী। কিন্তু গুয়ান্তানামোতে ওসব আইন আদালতের ধার আমেরিকানরা কখনোই ধারে না।

দুই বছর ছয় মাস হাসপাতালের হুইল চেয়ারে বন্দী থাকার পর মাশাল ভাই ফিরে যান সৌদি আরবে। তিনি কথা বলতে পারতেন না, নড়াচড়াও ছিল বন্ধ। বসতে বা শুতে গেলেও কারও সাহায্য নেওয়া লাগত। নিজ দেশে তাঁকে পাঠানো হয় সম্পূর্ণ জীবন্মৃত একজন মানুষ হিসেবে।

আমাদেরকে শাস্তি দেওয়ার আরেকটা ভয়াবহ পদ্ধতি ছিল এবং এর সাথে খাবার বন্ধ করে দেওয়াও যুক্ত হতো। শুরুর দিকে ভালো খাবার এবং ফল খেতে দিয়ে দিনে দিনে তা বাজে থেকে জঘন্য পর্যায়ে নেমে আসত। এজন্য তাদের এক অভিনব কৌশল ছিল। তারা সপ্তাহের শুরুতে বন্দীদের জিজ্ঞেস করত তাঁদের কী খেতে ভালো লাগে, কী ভালো লাগে না। এরপর যাঁর যেটা অপছন্দের, তাঁকে সেটাই খেতে দিত।

অধিকাংশ বন্দীই তো শুরুতে তাঁদের পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারে খোলাখুলি বলে দিয়েছিলেন। পরে বুঝলাম এখন থেকে আমাদের বলা উচিৎ এভাবে—মেন্যুতে যত খাবার আছে সবগুলোই আমাদের ভালো লাগে। এই বুদ্ধিতে আমরা সেই অদ্ভুত অত্যাচার থেকে কিছুদিনের জন্য এবং সামান্য পরিমাণে হলেও মুক্তি পেলাম।

সাধারণত মানুষ যেকোনো পরিস্থিতির সাথে দ্রুত মানিয়ে নিতে শেখে। এমনকি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডও একসময় তার কাছে সাধারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু গুয়ান্তানামোতে সবকিছুই দিনদিন খারাপ হতে থাকে। জেলের ব্লক এবং নির্জন কারাগারের সংখ্যা বাড়তে লাগল। শুরুতে শুধু একটি বেল্ট পরিয়ে আমাদের হাত বাঁধা হতো। পরবর্তীতে একটি আড়াআড়ি টাই দিয়ে আমাদের হাত পা বাঁধা হতে লাগল। জিজ্ঞাসাবাদ বা চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়ার সময় তিন থেকে চারটি তালাও লাগানো হতো শেকলের সাথে। আগে আমাদের চোখ খোলা রাখত, কিন্তু পরে সেটাও বেঁধে দেওয়া কেন যেন জরুরি হয়ে পড়ল।

শুরুতে ধর্মীয় বই পড়া যেত, কিন্তু পরে আইন পাল্টানো হয় এবং সে বইগুলোও বাজেয়াপ্ত করা হয়। এদের পরিবর্তে জায়গা করে নেয় অর্থনীতি, গণিত, রাজনীতি, জীববিজ্ঞান এবং ইতিহাসের বই। একসময় আমাদের ছোটখাটো ভুলত্রুটি এড়িয়ে যেত ওরা। কিন্তু পরে পান থেকে চুন খসলেই আর রক্ষা ছিল না। আর অযথাই মারধর করা তো ওদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল।

জিজ্ঞাসাবাদের সময় বন্দীদের ওপর কথা বলা এবং সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। যেসব ভাইয়েরা এসময় কথা বলতেন না, তাঁদের ওপর নেমে আসত অবর্ণনীয় অত্যাচার। তাঁদের ঘুমুতেও দেওয়া হতো না।

মোল্লা ফজল আকন্দকে ৪১ দিনের শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। রাতের বেলা তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ কক্ষে শেকল দিয়ে বেঁধে ফেলে রাখা হতো। এসি ছেড়ে দেওয়া হতো সর্বনিম্ন তাপমাত্রায়। আর সৈন্যরা তখন ধাতব বক্সে অনবরত লাঠির আঘাত করে যেত যেন ওরা গমের ক্ষেত থেকে পাখি তাড়াচ্ছে।

দিনের বেলায় তাঁকে সারাদিন হাঁটতে বাধ্য করা হতো যেন ঘুমিয়ে না পড়েন।

জিজ্ঞাসাবাদ কক্ষগুলো এত অন্ধকার করে রাখত যে আমার কান্দাহার বাজারের আড়তের কথা মনে পড়ে যেত। ওদের শাস্তির আরেকটা পদ্ধতি ছিল–বন্দীকে আপাদমস্তক শেকল দিয়ে বেঁধে একটি রুমে ফেলে রাখা এবং এসি ছেড়ে দেওয়া। হাত পা পুরোপুরি বাঁধা থাকায় কেউ নড়তেও পারতেন না সেখানে। কয়েকজন আরব ভাইকে ওরা ছোট স্পিড বোটে করে মাঝ সাগরে নিয়ে যেত। একে তো এ ভাইয়েরা কখনো সাগর দেখেননি কাছ থেকে, তার ওপর তীব্র গতিতে বোট চালানোর ফলে তাঁরা খুব ভয় পেয়ে যেতেন। একারণে অনেকে রাতে ঘুমুতেও পারতেন না। পরপর কয়েক সপ্তাহ জুড়ে এমন শাস্তি চলত।

মাঝেমধ্যে অসুস্থ বন্দীদের চিকিৎসার জন্য ডাক্তার আসত, কিন্তু সবচেয়ে বেশি যিনি আহত হয়েছেন তাঁকেও ডাক্তারের কাছে নিয়ে আসা হতো না। সপ্তাহের পর সপ্তাহ পার হয়ে গেলেও তাঁদের চিকিৎসা করানো হতো না। এমন শারীরিক এবং মানসিক শাস্তি, আতঙ্ক সব মিলে একজন বন্দীর অবস্থা দুর্বিষহ হয়ে পড়ত।

কান্দাহারের খারবাক থেকে আসা মোহাম্মদ ওয়ালী ছিলেন এমনই একজন। যত দিন যাচ্ছিল তাঁর অবস্থা তত খারাপ হচ্ছিল। কয়েকমাস কেটে গেল–কোনো ডাক্তার ডাকেনি কেউ, তাঁর ব্যথা উপশমের কোনো ব্যবস্থাও নেয়নি কেউ। তাঁর পুরো শরীর ফুলে গেল। তাঁকে এত যন্ত্রণা সহ্য করতে দেখাই আমাদের জন্য অসহ্য হয়ে দাঁড়াল। আমরা খাঁচার ধাতব শিকে আঘাত করতে করতে 'তাকবির! আল্লাহু আকবার!' ধ্বনি দিতে লাগলাম, সবাই মিলে। শেষ পর্যন্ত একজন দোভাষীকে ডেকে আনা হলো। ক্লিনিকে নিয়ে শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানা গেল তাঁর ব্লাড ক্যান্সার হয়েছে এবং তৎক্ষণাৎ একটি অপারেশন করানো লাগবে। সৌভাগ্যবশত সে যাত্রায় তিনি ভালো হয়েছিলেন।

আমাদের ক্ষুধা লেগেই থাকত। আমরা জেনেভা কনভেনশনের কথা বলতাম, যেখানে বলা আছে যে একজন কারাবন্দীকে পর্যাপ্ত খাবার দিতে হবে এবং সে যা খেতে চায় তা দিতে হবে। কিন্তু আমেরিকানরা বলত "এ

চুক্তি, ঐ আইন মানুষের জন্য প্রযোজ্য। আমাদের কোনো অধিকার নেই, কারণ আমরা মানুষ না। সুতরাং কোনো আইন মানতেও তারা বাধ্য নয়। তবু যে খাবারটা আমাদের দিচ্ছিল সেটাই অনেক।" এরপর আর বলার বা করার কিছুই থাকে না।

ওখানে সবকিছুই ছিল ব্যবসায়ীদের মতো লেনদেনের হিসেবে। যদি কোনো বন্দী জিজ্ঞাসাকারীকে সন্তুষ্ট করতে পারত, তার ভাগ্যে সবরকমের সুযোগ সুবিধা জুটত। এমন অনেক কিছুই সে পেত যেগুলো থেকে অন্যদের বঞ্চিত করা হতো।

যদি কেউ এক ক্যাম্প থেকে অন্য ক্যাম্পে যেতে চাইতেন তাহলে তাঁকে আগে জিজ্ঞাসাকারীদের কাছে গিয়ে সেটা বলতে হতো। ওখানে সন্তুষ্ট করতে পারলে যা চেয়েছেন তা পাওয়া যেত। ওদের অনুগত থাকলে টয়লেট পেপার, পানির বোতল পাওয়া যেত। যাওয়া যেত চতুর্থ ক্যাম্পেও। সবই সম্ভব যদি জানা থাকে কীভাবে তাদের সাথে খেলতে হবে। গল্প ফেঁদে বা গুপ্তচরের কাজ করতে রাজি হয়ে শুধু সুবিধা আদায় করে নিতে জানলেই হলো।

গুয়ান্তানামো কারাগারে একজন মানুষ কী পরিমাণ ভয়াবহ পরিস্থিতি সহ্য করেন তার সঠিক চিত্র পেতে হলে যেতে হবে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং ইকো ক্যাম্পে। এখানে বন্দীরা অত্যাচারিত হন, না খেয়ে থাকেন এবং হিম শীতল কক্ষে কোনো আবরণ ছাড়া রাত কাটাতে বাধ্য হন। আর এগুলো হয় এমন বন্দীদের ওপর যাঁদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ দায়ের করা হয়নি, মামলা করা হয়নি। এমনকি তাঁরা যে কোনো আদালতের কাছে গিয়ে নিজেদের পরিণতির ব্যাপারে প্রশ্ন তুলবেন, সে সুযোগও নেই।

পাঁচজন নিরীহ বসনিয়ান ভাইকে জিজ্ঞাসাবাদের সময় মারাত্মকভাবে অত্যাচার করা হয়। নিজেদেরকে সন্ত্রাসী হিসেবে স্বীকার করে নিতে তাঁদের বাধ্য করা হয়। অথচ আমেরিকানরা কোন যুক্তিতে তাঁদের এমন করতে বলছিল সেটাই তাঁরা বুঝতে পারছিলেন না। শেখ সাবির, মুহাম্মদ মুস্তফা এবং আলহাজ ছিলেন নির্বিবাদী ভালো মানুষ। তাঁরা এই অবিচারের আগামাথাই বুঝতে পারছিলেন না। শেখ সাবিরকে আরও বেশি অত্যাচার করার জন্য ক্যাম্প ফাইভে স্থানান্তর করা হয়, কারণ তিনি বারবার নিজেকে

নিরপরাধ দাবি করছিলেন। তিনি জোর দিয়ে বলছিলেন যে তাঁকে আগে নিশ্চিত করতে হবে কীসের ভিত্তিতে আমেরিকানরা তাঁকে সন্দেহ করছে। তিনি অন্য সকল বন্দীর কাছেও একই ব্যাপারে সাহায্য চাইছিলেন যেন আমরা আমেরিকার কাছে সবকিছুর ব্যাখ্যা চেয়ে জোরালো দাবি তুলি।

আমাদের কাছেও এর কোনো জবাব ছিল না। তাঁর কষ্টটা আমি বুঝতে পারছিলাম, কিন্তু আমরাও তো তাঁর মতোই অবিচারের শিকার হয়েছি। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এরপর টানা অনেকদিন তিনি আমার সাথে কথা বলেননি।

বসনিয়ান ভাইয়েরা কখনোই আফগানিস্তানের ধারে কাছেও আসেননি তাই তাঁরা বুঝতে পারছিলেন না তাঁদেরকে সন্ত্রাসী বলে গ্রেফতার করার কারণটা অন্তত কী হতে পারে। শেখ সাবির শেষপর্যন্ত বুঝতে পারেন যে আমেরিকানরা শুধু নিজেদের ক্ষমতা আর সুবিধার দিকটাই দেখে। যেহেতু বসনিয়ানরা সার্বিয়ানদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করছিল, তাই আমেরিকা সেখানকার মানুষকেও নিজেদের জন্য হুমকি হিসেবে ধরেছে।

পবিত্র কুরআনের অবমাননা

কান্দাহারের কথা তো আগেই বলেছি। সেখানে প্রহরীদের হাতে কুরআন শরীফ অবমাননার মতো ন্যাক্কারজনক ঘটনার কথা উল্লেখ করেছি। কিউবাতে প্রায় দশবারের মতো ইচ্ছাকৃত কুরআন অবমাননার ঘটনা ঘটেছে। প্রায় পাঁচ-ছয়বার কর্মচারীরা প্রতিজ্ঞা করেছে এ ধরনের কাজ ভবিষ্যতে আর না করার কথা বলে। কিন্তু ইচ্ছাকৃত এবং অনিচ্ছাকৃত তারা এর পুনরাবৃত্তি করেই গিয়েছে। ব্যাপারটা আমাদের অনেক কষ্ট দিত, রাগিয়ে তুলত।

ক্যাম্প ফাইভে হামজা বাতালকে নির্যাতন করতে করতে এমন অবস্থা করে ফেলা হতো যে তাঁর চোখ মুখ ফুলে যেত এবং তিনি আর কিছু দেখতে পেতেন না। যদিও আমাদের কাছে সৈন্যরা প্রতিজ্ঞা করেছিল যে তারা আর আমাদের কুরআন স্পর্শ করবে না, তবু তাঁর কাছে তাঁর কুরআনের কপিটি খোঁজ করেছিল ওরা। এরপর আমাদের প্রত্যেকের কুরআন খোঁজা হয়। খুব কষ্ট পেয়েছিলাম সেদিন, ক্ষোভ জন্মেছিল মনে। নিজেদের অনেক অসহায় মনে হচ্ছিল। বন্দীরা এমনিতেই পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্বল এবং অসহায়। আমাদের কোনো মানবাধিকার তাদের কাছে ছিল না, নিজেদের ঈমানের প্রতি সম্মান দেখানোর অধিকার থেকেও আমাদের বঞ্চিত করা হয়েছিল। নিজেদের এত কষ্ট এবং সম্মানহানির পরও পবিত্র কুরআনকে আমরা সবকিছুর ওপরে মূল্যায়ন করেছি। পবিত্র এই গ্রন্থের সম্মানে অনাহারে থাকতে, এমনকি জীবন উৎসর্গ করতেও আমরা প্রস্তুত ছিলাম।

এদিকে আমেরিকানদের কাছে এটি আমাদের শাস্তি দেওয়ার একটি উপায়ে পরিণত হয়েছিল। এভাবে একজনের সামনে অবমাননার মাধ্যমে অন্যদেরও তারা যন্ত্রণা দিত। আবার আমরা যদি অবমাননার ভয়ে নিজেদের কাছে থাকা কুরআনের কপিটি তাদের ফেরৎ দিয়ে দিতাম, তাহলে তারা আরও হিংস্রভাবে আমাদের ওপর অত্যাচার চালাত। একসময় প্রস্তাব করেছিলাম কুরআন–এর পরিবর্তে তাহলে অন্যকোনো ধর্মীয় বই দেওয়া হোক। কিন্তু তেমন কোনো সাড়া মেলেনি।

আবদুল্লাহ, যাঁর প্রথম নাম খাইরুল্লাহ, তাঁকে ভুলবশত বন্দী করা হয়। (আমার ধারণা, তাঁকে প্রাক্তন তালিবান কর্মকর্তা এবং হেরাত প্রদেশের শাসক খাইরুল্লাহর হিতাকাঙ্ক্ষী ভেবে আটক করা হয়েছে।) তিনি আমাদের কাছে কান্দাহার প্রদেশে বন্দী হওয়ার পর কী কী অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন তা বর্ণনা করেছেন। প্রতি ঘণ্টা অন্তর আমেরিকানরা এসে তাঁর খোঁজ নিত। হুমকি দিত, মারধর করত। তিনি বলেন, একবার তাঁকে কারাগারে নিয়ে বেঁধে উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখা হয়। তারপর তাঁর কুরআন শরীফের পৃষ্ঠাগুলো ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়। পরে আমেরিকান সৈন্যরা ক্যানাইন ইউনিটের একটি কুকুরকে লেলিয়ে দেয়, সেটি টুকরোগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সেগুলো মুখে তুলে নেয়। তারপর সৈন্যরা চিৎকার করে কুকুরটিকে ডাক দিলে সেটি কাগজের টুকরোগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দৌড়ে চলে যায়। সৈন্যরা এসে মাটি থেকে কুরআনের টুকরোগুলো তুলে নেয় এবং আবদুল্লাহর দিকে ছুঁড়ে মারে। কিন্তু সেগুলো বাক্সে গিয়ে পড়ে যেখানে বন্দীদের মলমূত্রসহ অন্যান্য আবর্জনা ফেলা হতো।

আবদুল্লাহ ভাই আমাকে বলেছেন, সেনাদের প্রতি চিৎকার, কান্না এবং এমন কাজ বন্ধের অনুনয়-বিনয় ছাড়া তাঁর কাছে এধরনের কঠিন অবমাননা প্রতিরোধ করার মতো কোনো পথই খোলা ছিল না। তিনি অসহায়ভাবে মেঝেতে পড়ে ছিলেন আর কুরআনের টুকরোগুলো ময়লার বাক্সের আশপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। তিনি আমাদের জানান, সে সময় তিনি আফসোস করে বলছিলেন, "হায়, পবিত্র কুরআন! তোমার তো কোনো দোষ নেই। তোমাকে নাজিল করাই হয়েছে মানব জাতিকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য, আর তা হলো ইসলাম। আমিও তো কোনো পাপ করিনি, কেবল তুমি যে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছ সেই নির্দেশ পালন করার চেষ্টা করেছি। হে কুরআন, আমার জন্য তুমি প্রমাণ ও সাক্ষী হয়ে যাও, আমিও তোমার জন্য সাক্ষী হয়ে যাব ইহকাল এবং পরকালে। সাক্ষী হব জঘন্য ও নিকৃষ্ট কাজ করা নিষ্ঠুর পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে, যাদেরকে কিছু মুসলিম বিশ্বাসঘাতক সহায়তা করেছে।

যখন শাকির নামক আরেক ভাইকে সৌদি আরব থেকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ধরে আনা হয়েছিল তখন তাদের ঠিক পায়ের নিচেই ছিল মহাপবিত্র

কুরআন। তাঁকে এই বলে হুমকি দেওয়া হচ্ছিল যে, তিনি যদি তাদের কাজে সহায়তা না করেন এবং তারা যা জানতে চায় তা যদি না বলেন তাহলে সে কুরআন শরীফ পদদলিত করবে। এসব শুনে শাকির ভাই ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি তাঁর এই চরম অভিজ্ঞতার কথা যখন অন্যান্য কারাবন্দীদের জানান তখন সবাই এতটাই কষ্ট এবং ক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন যে, তাঁরা এমন আচরণের বিরুদ্ধে অনশনের ডাক দেন। ফলাফলস্বরূপ পরবর্তী একমাস তাঁদের ওপর দমন পীড়ন আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে যায়।

এতকিছু করেও কারারক্ষীদের এমন ঘৃণিত কাণ্ড থেকে বিরত রাখা যায়নি। তারা কুরআন নিয়ে ক্যাচ খেলত, মাটিতে ফেলে দিত আর এমন ভান করত যেন তারা ইচ্ছে করে এমনটা করেনি। এসব নিয়ে পরে আবার ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ, হাসি-তামাশা করত। অথচ এগুলোর জন্য এসব বদমাশকে কখনোই শাস্তি দেওয়া হয়নি, এমনকি কেউ ওদেরকে মুখে দুটো কথাও শোনায়নি।

জোর করে কুরআন ছিনিয়ে নেওয়া এবং অবমাননা থেকে রক্ষা করার জন্য কয়েদিরা মাস্ক থেকে একটি ছোট কভার তৈরি করে নিয়েছিলেন। এটা দিয়ে তাঁরা কুরআনকে খাঁচার অনেক ওপরে ঝুলিয়ে রাখতেন। তাঁরা যখন খাঁচায় অনুপস্থিত থাকতেন বা হাসপাতালে অথবা জিজ্ঞাসাবাদ কক্ষে নিয়ে যাওয়া হতো, তখন তাঁরা পার্শ্ববর্তী সহবন্দীকে পবিত্র এই গ্রন্থের ওপর সতর্ক নজর রাখতে বলে যেতেন।

যুদ্ধের ভয়াবহতা

তাজিকিস্তানের ইউসুফ এবং ইয়েমেনীয় মুখতার ভাইকে গুয়ান্তানামো বে কারাগারে নিয়ে আসা হয়। আবদুর রশিদ দস্তমের দুর্গ ক্বালি জেঙ্গী থেকে তাঁদেরকে আনা হয়, ওখানেই তাঁরা গ্রেফতার হয়েছিলেন। উত্তরাঞ্চলীয় আফগানিস্তানের অবস্থা দিন দিন সঙ্কটপূর্ণ হচ্ছিল। উজবেকদের অধীনস্থ ন্যাশনাল ইসলামিক মুভমেন্ট অফ আফগানিস্তানের নর্দার্ন এলায়েন্সের লিডার কর্তৃক অনেক তালিবান কমান্ডারকে আটক করা হয়। তাঁদেরকে অবরুদ্ধ কুন্দুজ শহরের বাইরে, উত্তর আফগানিস্তান থেকে আটক করা হয়েছিল।

ইউসুফ এবং মুখতার ভাই আমার কাছে তাঁদের ক্বালি জেঙ্গীতে হস্তান্তর এবং বন্দী করার পর তাঁদের করুণ পরিণতির কথা বর্ণনা করেছেন। তাঁরা বলেন, তাঁরা দস্তমের সাথে চুক্তি করার পর তাঁদের অত্যাচার ও বন্দী না করে যৌথ বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করার শর্তে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। কিন্তু দস্তম চুক্তি ভঙ্গ করে তার সাঙ্গপাঙ্গদের মাধ্যমে তাঁদের গ্রেফতার করায়। এরপর অন্ধকূপে বন্দী করে রাখে। আহত মুজাহিদদের গুলি করে হত্যা করা হয় আর বেঁচে থাকাদের সাথে করা হয় নিকৃষ্টতম ঘৃণ্য আচরণ। একজন মুসলিমের সাথে অপর মুসলিমের এমন আচরণ ইসলামি নীতিবিরুদ্ধ এবং আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। তাঁদের কাঠের লাঠি এবং বন্দুকের বাঁট দিয়ে চোখে এবং মুখে নির্মমভাবে আঘাত করে অত্যাচার করা হতো। কারও কারও চোখ উপড়ে ফেলা হয়েছে। কাঠের সরু লাঠি তাঁদের কান, মুখ ও শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়ে মানহানিকর ভাবে ঢুকিয়ে দেওয়া হতো। কাউকে কাউকে উলঙ্গ করা হতো এবং ধাক্কা দিয়ে আগে থেকে আরও অনেক উলঙ্গ করে রাখা বন্দী দিয়ে পূর্ণ কন্টেইনারে ফেলে দেওয়া হতো, একে অনেকটা মৃতদেহের স্তূপের মতো দেখাত। অনেকেই এই অবস্থায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গেছেন।

এতকিছুর পরও যাঁরা বেঁচে থাকতেন তাঁদের দেওয়া হতো না কোনো খাবার বা পানীয়। এভাবে অনাহারে থাকতে থাকতেও অনেকে মৃত্যুর কোলে

ঢলে পড়েন। এমনকি যখন খাবার দেওয়া হতো, তখন হাত ঠিকই বাঁধা থাকত। সেই অবস্থায় যতটুকু ধরতে পারা যায় তা দিয়েই কয়েদীরা ক্ষুধা নিবারণের চেষ্টা করতেন। উজবেক (Uzbek) মিলিশিয়াদের পৈশাচিক আনন্দ দেওয়ার জন্য তাঁদেরকে নিজেদের মধ্যে মারামারিও করতে হতো। মিলিশিয়ারা তাঁদেরকে আক্রমণ করার জন্য ক্ষেপাত।

তালিব বন্দীরা (Talib prisoners) দস্তুম মিলিশিয়াদের কাছে আত্মসমর্পণ করার কারণে প্রায়ই আফসোস করতেন। তাঁরা ভেবেছিলেন বোঝাপড়ার মাধ্যমে তাঁদের মধ্যে একটি জোট গঠিত হবে। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক নর্দার্ন এলায়েন্স নিজেদেরকে বর্বর প্রমাণ করে। অনেক বন্দীই মৃত্যু কামনা করতেন তখন।

ইউসুফ তাজাকি নামের আরেক ভাই আমাকে বলেছেন, যখন তাঁর পকেটের সব টাকা নিয়ে নেওয়া হলো, তখন এক উজবেক সৈন্য তাঁর মুখের ভেতরেও তল্লাশি চালায়। সে একটি সোনালী রংয়ের দাঁত দেখতে পেয়ে সেটিকে টেনে আনার চেষ্টা করে। কিন্তু দাঁতটির গোড়া মাড়ির বেশ গভীর থাকায় সে সুবিধা করতে পারছিল না। রেগে গিয়ে ইউসুফের চোয়ালে অনেক জোরে আঘাত করে বসে সৈন্যটি। এরপর সে একটি ধাতুর দণ্ড পায় এবং সেটি দিয়ে দাঁতটি বের করে আনতে উদ্যত হয়। সাথে সাথে ইউসুফ ভাই তাকে থামার জন্য কাকুতি-মিনতি করে বলেন যে দাঁতটি সোনার না। বরং একটি নষ্ট দাঁতকে ঢেকে রাখার জন্য মূল্যহীন একটি ধাতব প্লেট মাত্র। লোভী সৈন্যটির এক সহযোগীও একই কথা বললে সে ইউসুফকে ছেড়ে দেয়।

যতবার ক্বালি জেঙ্গীর কথা আলোচনা করা হয়েছে, প্রতিবারই তরুণ এক ভাই কেঁদে উঠেছেন। তাঁর নাম ছিল মুখতার। তিনি বলেন, যখন তাঁরা বুঝতে পারলে যে ওখানে ঐ অবস্থায় বেঁচে থাকা খুব কঠিন, তখন তাঁরা উজবেক মিলিশিয়াদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। আশ্চর্যজনকভাবে তাঁরা নিজেদের মুক্ত করে সৈন্যদের ওপর আক্রমণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিছু অস্ত্রও তাঁরা দখলে নিয়েছিলেন, আর ঠিক তখনই আমেরিকানদের গোলাবর্ষণ শুরু হয়ে যায়।

জোরালো কণ্ঠে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি তুলে তাঁরা আমেরিকা এবং উজবেক সৈন্যদের ওপর নিজেদের সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। কোনোরকম সহযোগিতা ছাড়াই শুধুমাত্র অল্পকিছু অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ এবং সামান্য কিছু রসদ নিয়ে এই সাহসী তরুণেরা জোটবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রায় ছয়দিন যুদ্ধ চালিয়ে গেছেন। পুনরায় ধরা পড়বার আগে একদম শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শত্রুদের নাস্তানাবুদ করে রেখেছিলেন।

বিশ্বাসঘাতকতা, বন্দী করে নিয়ে যাওয়া এবং নিপীড়নের কারণে শতশত তরুণ প্রাণ হারিয়েছেন। যাঁরা আফগানিস্তানের যুদ্ধক্ষেত্রে শহীদ হয়েছেন।

মুহাম্মদ ইউসুফ আফগানও তাঁর গল্প শুনিয়েছেন। তাঁকে তাঁর গ্রাম থেকে তালিবান কর্তৃক নিযুক্ত করা হয়। যখন তাঁকে গ্রেফতার করা হয়, তিনি ভেবেছিলেন তাঁকে নিজ গ্রামে ফেরত পাঠানো হবে। কিন্তু পরে দেখেন অনেক বন্দীকেই লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মেরে ফেলা হচ্ছে।

একবার তল্লাশির সময় তিনি তাঁর অস্ত্র মিলিশিয়াদের নিকট সমর্পণ করেন। যাঁরা আহত হয়েছিলেন তাঁদের হত্যা করার পর বৃষ্টির পানি জমানোর পুলে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। সবার শীতবস্ত্র, পাগড়ী, ঘড়ি, টাকা এবং জুতা কেড়ে নিয়ে বেঁধে ফেলেছিল সৈন্যরা। তারপর বেদম প্রহার করা হয় তাঁদেরকে। মিলিশিয়ারা তাঁদের গায়ে থুতু নিক্ষেপ করে। কাউকে তো এত জোরে লাথি এবং ভয়ানক ভাবে প্রহার করা হয়েছিল যে, তাঁরা সেখানেই মৃত্যুবরণ করেছেন।

বাকি ৩২০ বন্দীকে গাদাগাদি করে একটি কন্টেইনারে করে নিয়ে যাওয়া হয়। মাজার-ই-শরীফ পৌঁছাতে তিনদিন সময় লেগেছিল এবং যাত্রাপথে প্রতিটি বিরতিতে বন্দীদের ওপর তারা অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছে। কন্টেইনারের দরজা খোলার সাথে সাথে সৈন্যরা প্রত্যেক বন্দীকে মাংসের কাটা টুকরার মতো করে নিক্ষেপ করত। জোরে জোরে লাথি দিয়ে, প্রহার করে দাঁড় করাত। এরপর আবার নিয়ে কন্টেইনারে ঢোকাত। তারপর দরজা লক করে দিত।

দরজা লক করার সাথে সাথে বন্দীরা সাহায্যের জন্য চিৎকার শুরু করতেন। কিন্তু কেউ তাঁদের কথা শুনত না। এমনকি তাঁদের তৃষ্ণা মেটানোর

পানি পর্যন্ত দেওয়া হতো না। ফলে অনেকেই সেখানে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। তাঁরা এতটাই ক্ষুধার্ত ছিলেন যে একপর্যায়ে একে অপরকে কামড়াতেও শুরু করেছিলেন! গাদাগাদি করে থাকা, ক্ষুধা, ক্লান্তি আর যাত্রাপথের ধকল, সব মিলে তাঁরা বাস্তব বিচারবুদ্ধি এবং আত্মিক অনুভূতি হারিয়ে ফেলেছিলেন।

কারও কারও হয়তো দৃষ্টিভ্রম হয়েছিল, কিংবা হয়তো সত্যিই তাঁরা কিছু দেখতে পেরেছিলেন। একসময় কয়েকজন ক্লান্ত স্বরে অন্যদের ডেকে বলতে থাকেন, "আরে দেখ দেখ, মহানবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসেছেন!" কেউ কেউ জান্নাতের কথা বলছিলেন। তাঁরা একপর্যায়ে মারা যান। তিনদিনের ভয়ানক এই যাত্রার পর শেষবারের মতো কন্টেইনারের দরজা খোলা হয়। অল্পকিছু মানুষ ছাড়া আর কেউ বেঁচে ছিলেন না।

মুহাম্মদ ইউসুফ আরও বলেন, কন্টেইনার থেকে বের হওয়ার সময় তাঁকে লাশগুলো মাড়িয়ে বের হতে হয়েছিল। বের হয়েই তিনি প্রথম যাকে দেখেন, সে ছিল রেড ক্রিসেন্টের একজন কর্মী। তারপর তাঁর চোখ বেঁধে ফেলা হয়।

তাঁকে তুর্কমেনিস্তানের উত্তরদিকে, সীমান্তে অবস্থিত জওযান প্রদেশের শাবার গান জেলখানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে যেতে প্রায় দুই ঘণ্টার মতো লেগেছিল। শাবার গানে গিয়ে অন্য বন্দীদের সাথে কথা বলে তিনি জানতে পারেন, তাঁরাও একইরকম পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে সেখানে গিয়ে পৌঁছেছেন।

অবস্থা এতটাই খারাপ এবং নিষ্ঠুর ছিল যে, ৮০০০ বন্দীর মাঝে মাত্র ৩০০০ জন বেঁচে ছিলেন। পাঁচ হাজার শহীদের মধ্যে কাউকে মাটি চাপা দেওয়া হয়, কাউকে পুড়িয়ে ফেলা হয়। আর অনেকের তো কোনো হদিসই জানা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতেও তাঁদের সম্পর্কে আর কিছু জানা যায়নি।

এই হত্যাকাণ্ডের আগে আমি ইসলামাবাদ থেকে অনেকবার দস্তমের সাথে কথা বলেছি। সে প্রতিবারই আমাকে বন্দীদের স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষার ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিয়েছে। আমি এব্যাপারে জাতিসংঘের প্রতিনিধি, মানবাধিকার কমিশন এবং ইসলামাবাদের রেড ক্রিসেন্ট প্রতিনিধির সাথেও

আলোচনা করেছি। তাদের কাছে বন্দীদের সুরক্ষা এবং অসুস্থ বন্দীদের বাঁচানোর ব্যাপারে তাৎক্ষণিক হস্তক্ষেপের জন্য আবেদন করেছি। কারণ জেনেভা কনভেনশান অনুযায়ী যুদ্ধবন্দীদের অধিকার রক্ষা করার জন্য বিশ্বনেতারা বাধ্য।

রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই ঘটনাটি খুবই গভীর এবং গুরুত্বপূর্ণ। ক্বালি জেঙ্গী এবং মাজার-ই-শরীফে চালানো হত্যাকাণ্ড এবং এর কারণ পুরোপুরিভাবে ব্যাখ্যা করানো প্রয়োজন। এমন অপরাধের জন্য রাষ্ট্রগুলোকেও ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা প্রয়োজন। ইতিহাস কখনোই এমন ভয়াবহ ঘটনা ভুলে যাবে না।

কান্দাহার প্রদেশের খোশবাব থেকে আগত আবদুল গনি আমাকে বলেছেন কীভাবে গভর্নর আবদুর রাজ্জাক তাঁকে বাড়ি থেকে অপহরণ করে সাবেক কমিউনিস্ট কমান্ডার আল্লাহ নূর-এর কাছে নিয়ে যায়। এই লোক কমিউনিস্ট সরকারের আমলে লস্কর গাহ মিলিটারি ইউনিটে কর্মরত ছিল। কমিউনিস্ট সরকার পতনের পর সে পাকিস্তানে পালিয়ে যাওয়ার আগে কয়েক হাজার মুজাহিদকে হত্যা করে। আমেরিকানরা আক্রমণের পর তাকে আবার কান্দাহার বিমানবন্দরের কমান্ডার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।

আবদুল গনিকে অপহরণ করে কান্দাহার প্রদেশের গভর্নরের কাছে নিয়ে যাওয়ার পর তাঁর বিরুদ্ধে বিমানবন্দরে রকেট হামলার অভিযোগ আনা হয়। তাঁকে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে গ্রেফতার দেখানো হয়। এরপর তাঁকে একটি রুমে নিয়ে যাওয়া হলে তিনি সেটির দেয়ালে রক্তের ছিটা দেখতে পান। আটককারীরা একটি ধাতব তার নিয়ে এসে তাঁকে অনবরত মারতে শুরু করে। কারণ তারা জানত তিনি কখনো এসব অভিযোগ স্বীকার করবেন না।

একপর্যায়ে তারা মারধরের ধরনে পরিবর্তন আনল। রাতের বেলা তাঁকে একটি রুমের মাঝখানে টানটান করে হাতে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হতো, অনেকটা ক্রুশবিদ্ধ ব্যক্তির ভঙ্গিতে, যতক্ষণ না তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। এরপর তাঁকে উল্টো করে ঝুলিয়ে দেওয়া হতো। আর দিনের বেলা সারাদিন ধরে পেটানো হতো। রাতের বেলা আবার সেই ঝুলিয়ে রাখার শাস্তি।

তিনি বলেন, ক্রমাগত এই অমানুষিক নির্যাতন সইতে না পেরে এক পর্যায়ে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ স্বীকার করে নেন। অথচ ছেড়ে দেওয়ার পরিবর্তে তারা তাঁকে তুলে দেয় আমেরিকার হাতে।

সৌদি আরবের ভাই গুসান তাঁর বন্দীত্বের গল্প আমাকে শুনিয়েছেন। তাঁরা লাহোরে কিছুদিন যাবত বসবাস করছিলেন যেন সেখান থেকে আফগানিস্তানে যাওয়ার কোনো পথ বের করতে পারেন। হঠাৎ এক রাতে তাঁর এক পাকিস্তানী বন্ধু এসে বলল আমেরিকা সেখানে একটু পর হামলা চালাতে যাচ্ছে। তিনি দ্রুত উঠে পড়েন এবং দেখেন যে পুরো বাড়ি পাকিস্তানী সৈন্যরা ঘিরে রেখেছে। তারা পাল্টা আক্রমণের ভয়ে বাড়িতে ঢুকতে পারছে না। তাদের ধারণা ছিল, বাড়ির লোকদের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র আছে।

কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে পাকিস্তানীরা বাড়ির ভেতরে ঢুকতে শুরু করে এবং একজন দোভাষীর মাধ্যমে ঘোষণা করতে থাকে যে তাদের সাথে কোনো আমেরিকান সৈন্য নেই। যদি বাড়ির লোকেরা আত্মসমর্পণ করে তাহলেই তারা তাঁদেরকে সাহায্য করতে পারবে। আরও বলে, তাঁদেরকে আমেরিকার হাতে তুলে দেওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না, যেহেতু তারা এসেছে নিজেদের আরব এবং মুসলিম ভাইদের সাহায্য করতে। সৈন্যরা প্রতিজ্ঞাও করল এই বলে যে, তারা অন্য কোনো দেশে তাঁদেরকে নিরাপদে পাঠিয়ে দেয়ার বন্দোবস্ত করবে।

এসব শুনে গুসান ভাই সহ অন্যরা বেরিয়ে আসেন। পাকিস্তানী সৈন্যরা প্রথম সুযোগেই তাঁদের সবকিছু লুট করে নেয়। তারপর সবাইকে বেঁধে তুলে দেয় আমেরিকার হাতে। আমেরিকান লোকগুলো তাঁদের দেখে প্রচণ্ড শব্দে চিৎকার করছিল, আঘাত করছিল শারীরিকভাবে। তারপর এনে আটকে রাখল ছোট ছোট অন্ধকার কালো রুমে।

পাকিস্তানী বাহিনী তাঁদের বলেছিল যদি তাঁরা কোনো ঘুষ দিতে পারতেন তাহলে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া যেত। তাঁদেরকে পাকিস্তানীরা অত্যাচার করতে থাকে আর বলতে থাকে আমরা তোমাদের ভাই কিন্তু এমন করতে বাধ্য হচ্ছি। কারণ আমাদের এত টাকা নেই যা দিয়ে আমরা আমেরিকার কাছ থেকে নিজেদের স্বাধীনতা কিনে নেব।

আটককৃতদের মধ্যে দুই ভাইয়ের কথা জানি যাঁদের প্রথমজন ছিলেন একজন আলিম, অন্যজন ছিলেন একজন ইংরেজি শিক্ষক। তাঁরা পাকিস্তানে অভিবাসী হিসেবে বাস করছিলেন। জালাল ছিলেন পেশোয়ারে একটি সংবাদপত্র এবং কয়েকটি ছোটখাটো ম্যাগাজিনে কাজ করা একজন সাংবাদিক। তাঁকে পাকিস্তানী বাহিনী গ্রেফতার করে আমেরিকার কাছে বিক্রি করে দেয়। সন্দেহাতীতভাবে এই মানুষগুলোর সাথে তালিবানের কোনো সংযোগ ছিল না। জালালের এক ভাইয়ের নাম আবদুর রাহীম, তিনি ছিলেন একজন আলিম। আর তাঁদের আরেক ভাইয়ের নাম ছিল বদরুজ্জামান। পাকিস্তানী সিক্রেট সার্ভিস ISI তাঁদেরকে কয়েক মাস কারাবন্দী করে রাখে।

জালাল আফগানিস্তানের ব্যাপারে তাঁর ভাইদের সাথে কথা বলছিলেন। প্রশংসা করছিলেন মানুষগুলোর সাহসিকতার। তাঁরা কেউই পাকিস্তানের সমালোচনা বা একে অসম্মান করে কিছু বলেননি।

রাতের আঁধারে পাকিস্তানী সৈন্যরা তাঁদের ওপর ড্রাগনের মতো করে এসে হামলা চালায়। বাড়িতে অবস্থানরত নারী ও শিশুদের ওরা পাত্তাই দেয়নি। তাঁদের যা কিছু ছিল সবকিছু তারা লুট করে নিয়ে নেয়। এরপর ভাইদেরকে শেকলে বেঁধে চোখও ঢেকে দেয় কালো কাপড় দিয়ে। বাচ্চারা আর তাদের মা-রা চিৎকার করে কাঁদছিল যখন তাঁদের বাড়ি থেকে ঠেলে বের করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। কেউ বুঝতে পারেনি—পাকিস্তানী বাহিনী কেন তাঁদের ওপর হামলা চালিয়েছে। আইএসআই–এর ডিটেনশন রুমে বন্দী হওয়ার পর তাঁরা বুঝতে পারলেন খুব খারাপ কিছু তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছে।

অনেকবার তাঁদের হুমকি দেওয়া হয়েছে, অত্যাচার করা হয়েছে ইচ্ছেমতো। তাঁরা আফগানিস্তানে কাজ করতেন, এটা প্রমাণ করার জন্য সবরকমের অভিযোগও প্রস্তুত করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদের সময় তাঁদের প্রচুর প্রশ্ন করা হতো, কিন্তু তাঁরা কোনোভাবে সে কাজগুলোর সাথে জড়িত থাকলেই না উত্তর দিতে পারবেন! সেখানে কিছু আমেরিকানও ছিল, কিন্তু তাদের আলোচনার একমাত্র বিষয় ছিল মূল্য পরিশোধ। এদিকে ভাইদের কাছেও ঘুষ দেওয়ার মতো টাকা ছিল না, ফলে তাঁদেরকে আমেরিকার কাছে বিক্রি করে দেওয়া হয়।

পরে অবশ্য তাঁরা গুয়ান্তানামো থেকে বেকসুর খালাস পেয়েছিলেন, যেহেতু তাঁদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট কোনো অভিযোগই আনা যায়নি।

দুর্নীতিবাজ পাকিস্তানী কর্মকর্তাদের ঘুস দিতে না পারায় ওয়ালী মুহাম্মদ শরাফ, আবদুর রহমান নুরানি এবং আরও অনেক আফগানীকে আমেরিকার কাছে বিক্রি করে দেওয়া হয়। তাঁদেরকে তালিবানের লোক বলে অভিযুক্ত করা হয়। কোনো অভিযোগ ছাড়াই তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়। অন্যদিকে হাজী ওয়ালী মুহাম্মদ নিজের গাড়ি এবং বিশাল অঙ্কের টাকা খোয়ানোর পর এখনও গুয়ান্তানামোতে বন্দী হয়ে আছেন।

বহু আল্লাহভীরু আরব, আফগান ভাইয়ের এমন অনেক হৃদয় দুমড়ে মুচড়ে দেওয়া গল্প জানি যেখানে তাঁদের বাড়ি থেকে তুলে এনে নরকতুল্য গুয়ান্তানামো বে-তে ফেলা হয়েছে। এখানে অনেক দেশেরই মুসলিম ছিলেন, কিন্তু আরব আর আফগানদের সাথেই সবচেয়ে নিকৃষ্ট আচরণ করা হতো। তাঁদের প্রত্যেকের অত্যাচারিত হওয়ার কাহিনী বিস্তারিত আলোচনা করা অত্যন্ত কষ্টদায়ক।

এসব গ্রেফতার, অন্যের হাতে তুলে দেওয়া, অত্যাচারের কুকর্মের সাথে পাকিস্তানী সরকার এখনও জড়িত। দেশটিতে অসংখ্য ব্ল্যাক সাইট আছে যেখানে এখনও টাকার বিনিময়ে এমন নির্যাতন চলছেই। কিউবায় বন্দী কয়েদীরা পাকিস্তানের নাম দিয়েছেন মাজবুরিস্তান (অর্থাৎ এমন একটি দেশ যেখানে চরম দুঃখ দুর্দশা বিরাজ করে) এবং আমেরিকার চাকর।

কিউবাতে এমন অনেক বন্দী ছিলেন যাঁদেরকে মুশাররফ সরকারের সাহায্যে গ্রেফতার করা হয়েছিল। মুশাররফের সাথে ছিল তৎকালীন আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এই দুই বদ রাষ্ট্রের মধ্যে একটি চুক্তি ছিল। আল্লাহ সমস্ত মুসলিমকে এই যুদ্ধবাজদের হাত থেকে রক্ষা করুন।

*

জাতিসংঘ সনদে উল্লিখিত 'মানবাধিকারের বৈশ্বিক ঘোষণা'র দিকে আমি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এই ঘোষণাপত্রটি প্রস্তুত হয়েছিল সমগ্র মানবজাতির অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। জাতিসংঘের সদস্যরা দলিলটির

মাধ্যমে মানুষের মৌলিক অধিকার, সম্মান এবং ব্যক্তি মানুষের মর্যাদার প্রতি তাঁদের বিশ্বাসের কথা পুনর্নিশ্চিত করেছিলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান নাৎসি বাহিনীর হাতে নারী ও শিশুসহ লক্ষাধিক মানুষ নিহত হওয়ার পর জাতিসংঘ গঠিত হয়। জাতিসংঘ সনদের ভিত্তিই ছিল 'মানবাধিকারের বৈশ্বিক ঘোষণা'। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোও ভবিষ্যতে এধরনের গণহত্যা ঠেকাতে এই ঘোষণাপত্রকে গ্রহণ করেছে।

প্রতিটি মানুষের মাঝে সাম্য এবং অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর সাথে চুক্তিবদ্ধ কোনো রাষ্ট্রই অন্য রাষ্ট্রে অবৈধ হামলা চালাবে না এবং সবারই অন্য যেকোনো মানুষকে রক্ষা করার পণ থাকবে। জাতিতে জাতিতে চলতে থাকা সমস্ত সংঘাতের শান্তিপূর্ণ সমাধান আসতে হবে। প্রতিটি জুলুম এবং সমস্যার জন্য আলাদা আলাদা আইন থাকতে হবে–হোক তা কোনো দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি বা একজন মানুষের মৌলিক অধিকারের লঙ্ঘন। মানুষকে সম্মান করা হবে এবং এর মাঝে তার ধর্মীয় মর্যাদাও অন্তর্ভুক্ত।

ট্রাইব্যুনাল গঠন করে এবং আন্তর্জাতিক আইন ও আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি হবে। জনগণ এবং তাদের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। কোনো জাতি বা ব্যক্তিকেই ছোট করে দেখা যাবে না। ঔপনিবেশবাদের অবসান হতে হবে এবং পরাশক্তিগুলোকে কম শক্তিশালী রাষ্ট্রের ওপর শোষণ বন্ধ করতে হবে।

আমি বিশ্বাস করি জাতিসংঘ উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোকে ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করেছে আর নিজেদের দলিলপত্র তো ওরা একদমই মানছে না। ৯/১১ পরবর্তী ইরাক এবং আফগানিস্তানের ওপর তাদের হামলা মানবাধিকারের সবচেয়ে বড় লঙ্ঘনের ঘটনা। আর তা জাতিসংঘের নাকের ডগায় বসেই চালিয়েছে আমেরিকা ও তার মিত্ররা।

১৯৪৯ সালে স্বাক্ষরিত জেনেভা কনভেনশনকে বলা হয় সমগ্র মানবজাতিকে সম্মান করার আন্তর্জাতিক আইন। ১৯৮০ সালের জাতিসংঘ অধিবেশনের সময় এখানকার চুক্তিগুলো নিয়ে আবারও আলোচনা করা হয় এবং এতে যুদ্ধের নীতিমালাও অন্তর্ভুক্ত হয়। এই নীতিগুলো প্রতিটি দেশের ঐতিহ্যগত মর্যাদাকে রক্ষা করে এবং দেশগুলোর অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক

কদরের প্রসার ঘটায়। আর সবকিছুর ওপরে এই নীতিগুলো যুদ্ধবন্দীদের অধিকার সুরক্ষার কথা বলে।

আমি পাঠককে তৃতীয় এবং চতুর্থ জেনেভা কনভেনশনের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যেখানে স্পষ্টভাবে বলা আছে যে, যুদ্ধাপরাধের দায়ে অভিযুক্ত একজন ব্যক্তিকে নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা, কোনো স্বাধীন মানুষকে জিম্মি করা, অবৈধভাবে বিদেশে পাচার করা কিংবা একটি স্বাধীন দেশের নাগরিককে অযথা বন্দী করা মানে হলো জেনেভা কনভেনশনের চরম লঙ্ঘন।

তবে এতকিছুর পরও আমেরিকা যেকোনো ব্যক্তিকে, হোক আমেরিকান বা অন্য দেশের নাগরিক, 'শত্রুযোদ্ধা' হিসেবে বিবেচনা করে নেয় যদি তাদের সন্দেহ হয় যে, মানুষটি আল-কায়েদা বা তালিবানের সদস্য, চর কিংবা যেকোনোভাবে এদের সাথে বা এমনই অন্যকোনো সংগঠনের সাথে জড়িত। আর তখনই সমস্ত আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তিকে পাত্তা না দিয়ে মানুষটাকে যেভাবেই হোক কারাবন্দী করে ফেলে তারা।

গুয়ান্তানামোসহ বিশ্বজুড়ে সমস্ত ব্ল্যাক সাইটের প্রশাসকরা আমাদের রক্ষার জন্য স্বাক্ষরিত যাবতীয় আন্তর্জাতিক চুক্তির খেলাপ অবিরাম করে যাচ্ছে। জাতিসংঘ সনদের শর্তগুলো সকল মানুষের সাম্যের ওপর জোর দিয়েছে এবং মুসলিমদের এ থেকে বাদ দেওয়া যাবে না কোনোমতেই। কিন্তু কিউবাতে মুসলিমদের উপর আক্রমণ, পাচার, নির্যাতন করা হয়েছে, তাঁদেরকে পুরো পৃথিবী থেকে একরকম মুছে দেওয়া হয়েছে এবং দুর্ব্যবহার করা হয়েছে খাঁচায় বন্দী পশুর চাইতেও নিকৃষ্টভাবে। এই মুসলিমরা ন্যায়বিচার এবং আইনী সহায়তার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। বঞ্চিত হয়েছেন নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা থেকেও। তবু আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক। হাসবুনাল্লাহু ওয়া নিমাল ওয়াকীল–একমাত্র আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই সবকিছুর নিয়ন্তা। এখনও যাঁরা বন্দী অবস্থায় আছেন আল্লাহ তাঁদের সবাইকে হেফাজত করুন।

মিথ্যা ধরার পরীক্ষা

একবার আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ কক্ষে নিয়ে গেলে সম্পূর্ণ নতুনরূপে একে দেখলাম। রুমের ঠিক মাঝখানে আছে একটি সাদা চেয়ার। সেখানে আমাকে বসালেও এবার হাত দুটো বাঁধা হলো না। আগে এমনটি কখনোই হয়নি। একজন ফার্সি দোভাষীসহ এক আমেরিকান এসে আমাকে একটি Lie Detector Machine দেখাল।

"কেউ মিথ্যে বললে এই যন্ত্র ধরে ফেলে, কেউ সত্য বললেও এই যন্ত্র তা বোঝে," আমেরিকান লোকটা সোৎসাহে বলল। সে জিজ্ঞেস করল, আমি এই যন্ত্রের পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে চাই কি না। বলল, তাদের ধারণা আমি সত্য বলছি না। তারা আমার মুখ থেকে আগে করা প্রশ্নগুলোর জবাবও শুনতে চায়, আমি সত্য বলেছি নাকি মিথ্যা বলেছি তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য। আমি শান্ত কণ্ঠে বললাম, এই টেস্ট তোমাদের শুরুতেই করা উচিত ছিল। তাহলে আর এতদিন ধরে আমার এসব শাস্তি পেতে হতো না। এত কষ্ট সইতে হতো না।

তারা প্রশ্ন করতে শুরু করল–

"তোমার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি জানে কে?"

"আমার আল্লাহ।"

"তারপর?" আবার জিজ্ঞেস করল।

"আমি নিজে।"

"তৃতীয়তে কে?"

"আল্লাহ ছাড়া আর কেউ আমার মনের গোপন খবর জানে না।"

"তিন নম্বরে আমি," বাঁকা হাসি হেসে বলল সে। "কারণ আমি এখন তোমার মনের ভেতরের সবকিছু বের করে নিয়ে আসব।"

"নিজেকে এত বড় ভেব না। তোমার বাপেরও সাধ্য নাই আমার অন্তরের খবর জানবে," একটু কড়া সুরেই বললাম কথাটা। তারপর বললাম, "কী জিজ্ঞেস করবে কর।"

আমার শরীরের সাথে মেশিনটির বিভিন্ন তার আটকে দেওয়া হলো। মোট পাঁচটি তারের দুইটি লাগানো হলো পিঠের সাথে, দুইটি দুই আঙুলে আর একটি লাগানো হলো বাহুতে। সে প্রশ্ন করা শুরু করল। প্রথমদিককার কথাগুলো ছিল একেবারেই মামুলি ধাঁচের প্রশ্নোত্তর। এই ফাঁকে যন্ত্র আমার রক্তচাপ, হৃদস্পন্দন, তাপমাত্রা রেকর্ড করে নিয়েছে। পাশে এক স্ক্রিনে একটি ইকোকার্ডিয়াম দেখাচ্ছে।

এই মেশিন আর জিজ্ঞাসাবাদের ঘটা দেখেই তো যে কারো উদ্বেগ, মানসিক চাপ বেড়ে যাবে। সুতরাং যাদের হৃদয় দৃঢ় তারাই এর সামনে টিকে থাকবে। আর দুর্বল হৃদয়ের মানুষ সহজেই এখানে কাবু হয়ে যাবে। ধরা যাক, কেউ সব প্রশ্নের উত্তর এমনভাবে দিচ্ছে যেখানে আল্লাহর প্রতি তার একান্ত আনুগত্য প্রকাশ পাচ্ছে। তখন ওরা জিজ্ঞেস করবে, সে কখনো এমন কিছু করেছে কিনা যাতে আল্লাহর অবাধ্যতা করা হয়েছে। ব্যস শুরু হয়ে গেল উদ্বেগ, মেশিনও তা প্রকাশ করতে লাগল।

যদি কেউ আত্মবিশ্বাসের সাথে এবং দ্রুত উত্তর দিয়ে দেয়, তাহলে যন্ত্রে ইতিবাচক সঙ্কেত আসে। আর যদি উত্তর দেওয়ার আগে একটু বিচলিত হয় কিংবা দীর্ঘ সময় ভাবে বা সন্দেহ প্রকাশ করে তাহলে যন্ত্র একে মিথ্যে হিসেবে দেখায়। সত্যি বলতে, আদালতের মতো জায়গায় এই যন্ত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য গ্রহণযোগ্য নয়। তবুও বন্দীদের ভয় দেখাতে আমেরিকানরা এটি ব্যবহার করে।

এমনিতে মিথ্যে বলা খুব খারাপ একটি অভ্যাস এবং কেউ যখন মিথ্যে বলে তখন আপনাতেই তার মধ্যে একটি অস্থিরতা কাজ করে। কিন্তু এই অস্থিরতাকে অন্য কোনো অস্থিরতা বা উদ্বেগের সাথে গুলিয়ে ফেললে বিরাট সমস্যা। আর এই যন্ত্রের রিডিংয়ের ওপর নির্ভর করলে ঠিক এই ঘোল পাকানোটাই ঘটে।

আরেকবার জিজ্ঞাসাবাদের সময় এক বেঁটে কালো মহিলা এলো, তাকে আগে কোনোদিন দেখিনি। সাথে থাকা দোভাষী পশতু ভাষায় বলল টেবিলে পানি এবং ফ্রেঞ্চ ফ্রাই রাখা আছে। তারপর তারা আমার শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে টুকটাক কিছু কথাবার্তা জিজ্ঞেস করে টেবিলের ওপর একটি ম্যাপ বিছিয়ে দিলো। ম্যাপটিতে একটি রেখা টানা আছে যা আফগানিস্তান থেকে শুরু হয়ে

আরব আমিরাত থেকে সুদান এবং ইউরোপের দিকে চলে গেছে। আর শেষ হয়েছে দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোতে গিয়ে। তারা বলল এটা হলো স্বর্ণ চোরাচালানের রুট। তাদের বিশ্বাস আমি স্বর্ণ চোরাচালানের সাথে জড়িত।

বিস্ময়ে কথা বলার ভাষা হারিয়ে ফেললাম আমি তাদের কথা শুনে। কিছু মানুষ কতটা নিষ্কর্মা হলে এত এত উদ্ভট কথাবার্তা নিয়ে হাজির হয়ে অযথা সময় নষ্ট করতে পারে একজনের পেছনে!

আমি ম্যাপটির দিকে তাকিয়ে বললাম, "আফগানিস্তানে একটা দাগ দেখা যাচ্ছে। বোঝাই যাচ্ছে ওখানে খনি থেকে টনকে টন স্বর্ণ উত্তোলিত হয়। তাই না?"

"হ্যাঁ, ঠিক তাই।" হাসিমুখে তাদের জবাব।

আমি তৎক্ষণাৎ বললাম, "তোমরা যদি প্রমাণ করতে পার যে আফগানিস্তানে স্বর্ণখনি আছে, তাহলে তোমাদের সমস্ত অভিযোগ আমি স্বীকার করে নেব।" কিছুটা উত্তেজিতও হয়ে পড়েছিলাম আমি ওদের মূর্খতা দেখে।

স্বর্ণখনি কোন দেশে আছে সেটা না জেনেই ওরা এসেছে স্বর্ণ ব্যবসার তদন্ত করতে। তারা কয়েকটা প্রশ্ন লিখে এনে আমাকে জিজ্ঞেস করছিল। একবার জিজ্ঞেস করল যে আমি কখনো পেশাওয়ার গিয়েছি কি না। যদিও আমি বলেছিলাম আমি যাইনি, তবুও তারা জানতে চাইল পেশাওয়ারে কেন গিয়েছিলাম।

এই হলো অবস্থা যাদের ওপর আমেরিকা গোপন তথ্য সংগ্রহের ভার দিয়ে বসে আছে। কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ছাড়াই আবোলতাবোল কতগুলো প্রশ্ন করে গেছে ওরা। নিজেরা যেসব দেশে আক্রমণ করেছে সেগুলো সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণাও ওদের নেই। মনগড়া এক প্রশ্ন থেকে আরেক প্রশ্নে লাফিয়ে বেড়ানোর নাম তারা দিয়েছে তদন্ত, জিজ্ঞাসাবাদ। অথচ জিজ্ঞাসাবাদের কোনো কৌশলই ওখানকার লোকগুলো জানে না।

বৈজ্ঞানিক উপায়ে কথা বের না করে আমাদের ব্যক্তিজীবন, কর্মজীবন সম্বন্ধে অযথাই প্রশ্ন করে গেছে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চেয়েছে কবে কখন কোথায় গিয়েছি, কেন গিয়েছি। তাদের সম্পূর্ণ আগ্রহ জুড়ে আছে শুধু গোপন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের খবর আর তাদের অবস্থান। মাদরাসা, অন্যান্য

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়ী, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে ওদের আগ্রহের শেষ নেই। সমস্ত রাজনৈতিক দল, দলগুলোর সভা সমাবেশ, একটি দেশের মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক ভেদাভেদ, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মতপার্থক্য সব কিছু সম্পর্কেই তাদের সম্যক ধারণা ছিল।

শুরুতে জিজ্ঞাসাবাদের বিষয়বস্তু থাকত আফগানিস্তানের সমসাময়িক পরিস্থিতি। কিন্তু যতই দিন যাচ্ছিল, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, বিখ্যাত আলিম এবং বিভিন্ন মাদ্রাসা নিয়ে তাদের প্রশ্ন ততই বেশি বেশি হতে লাগল। তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য ছিলাম আমি। আমাকে আফগানিস্তানের সমস্ত খনি নিয়ে প্রশ্ন করত–বিশেষ করে তেল, গ্যাস, ক্রোমাইট, পারদ, স্বর্ণ, রুবিপাথর এবং অন্যান্য দামি দামি পাথর আর ধাতুর খনি সম্পর্কে।

কয়েকবার ওরা ইউরেনিয়ামের অস্তিত্ব নিয়ে জিজ্ঞেস করেছে। যখন বললাম, ইউরেনিয়াম সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না, তখন ওরা আমাকে মেরে দূরের এক নির্জন কারাগারে নিয়ে ফেলে। সে কারাগারের কক্ষে কোনো জানালাও ছিল না।

আমাকে বারবার শুধু বিভিন্ন মাদরাসা এবং সম্মেলন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হতো। যেমন মানসুরাহতে কুতাইবা সম্মেলন, দেওবন্দ, পাকিস্তান, লিবিয়ার সম্মেলন। জিজ্ঞেস করা হতো বিভিন্ন আলিমের সমাবেশ আর ধর্মীয় আলোচনা সম্পর্কে। অথচ এগুলোর সবগুলো সম্পর্কেই সংবাদ সম্মেলন করে বিস্তারিত জানানো হয়েছে। এবং বহির্বিশ্ব সম্পর্কে সচেতন প্রত্যেকেই এদের সম্পর্কে জানে।

মনে হলো তারা মূলত মাদরাসার কাজ, এদের পরিচালনা ব্যবস্থা নিয়েই আগ্রহী। এছাড়া বিভিন্ন আলিম, দাঈদের সম্পর্কে আমি যা জানি আর তাঁদের সাথে আমার যোগাযোগ কেমন সেগুলোও জিজ্ঞেস করলে আমি বললাম আমি তাঁদেরকে তেমন চিনি না। এবার তারা জাকাত ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন করা শুরু করল। জিজ্ঞেস করল বিভিন্ন মানবিক সংগঠন, সেগুলোর দাতা এবং প্রাপ্ত অর্থ কোথায়-কীভাবে ব্যয় হয় সেসব সম্পর্কেও। বিখ্যাত বাণিজ্যিক সংগঠন এবং গণ্যমান্য কয়েকজন ধর্মীয় নেতার প্রভাব সম্পর্কে, শিল্প সংস্কৃতি সম্বন্ধে, আমার দেশের আমদানি-রপ্তানি সম্পর্কে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কেও ওরা জিজ্ঞেস করতে ছাড়ল না। আফগানিস্তানের

শিক্ষাব্যবস্থা এবং শিক্ষা তহবিল কোথা থেকে আসে এই উত্তর বের করার জন্য ওরা আমাকে রীতিমত নাজেহাল করে ফেলেছিল।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হলো–দখলদারদের ঠেকাতে আফগানিস্তানের সক্ষমতা যাচাই করে নিচ্ছে ওরা।

একবার ওরা আমাকে ইয়েমেনের ইউএসেস কোল-এ বোমাবর্ষণের মূল হোতা হিসেবে অভিযুক্ত করে বসল। বলল ওখানে এগারোজন আমেরিকান সৈন্য হত্যার পেছনে আমিই দায়ী। তাদের দাবি, ২০০০ সালের ১২ অক্টোবর সেই ঘটনার সময় আমি ইয়েমেনেই ছিলাম।

অবাক হয়ে জানতে চাইলাম, "আমি কেমন করে ইয়েমেনে গিয়েছি?"

"তুমি প্রথমে গিয়েছ ইরানে। তারপর কাতারে। সেখান থেকে ইয়েমেনে," তারা জবাব দিলো।

"তোমরা আদেন হারবারে আমার পৌঁছানোর কোনো প্রমাণ দেখিয়ে নিজেদের বক্তব্য প্রমাণ করতে পারবে? যেভাবে সবকিছুর বিবরণ দিচ্ছ, দেখে তো মনে হয় তোমাদের কাছে সব নথিই আছে।"

তাদের কাছে কোনো রেকর্ডই ছিল না। জিজ্ঞেস করলাম আমি কীভাবে বিস্ফোরক বয়ে নিয়ে গিয়েছি। তারা বলল যে তাদের কোনো ধারণাই নেই। আর এর মাধ্যমেই বোঝা যায় যে ঐ জাহাজটার যাত্রার নির্দিষ্ট সময় বা গন্তব্য সম্পর্কেও আমি কিছু জানতাম না। আসলে ইয়েমেনীয় সমুদ্রপথে চলাচলকারী কোনো জাহাজ সম্পর্কেই আমার কোনো জ্ঞান ছিল না। তাহলে কেমন করে আমি ইরান থেকে কাতার, তারপর সেখান থেকে ইয়েমেনে যাব, যখন এই তিনটি দেশের কোনোটিতেই আমি কখনো যাইনি?

বললাম যদি তারা প্রমাণ দেখাতে পারে যে আমি ইয়েমেনে গিয়েছি, তাহলেই আমি সব দোষ স্বীকার করে নেব।

এভাবে একের পর এক মিথ্যে অভিযোগ আর অনবরত উদ্ভট প্রশ্ন করে যাওয়া একজন বন্দীর মনের ওপর সাংঘাতিক চাপ সৃষ্টি করে। তিনি একসময় নিজেকে অসহায় ভাবতে শুরু করেন। আমিও একরকম বিষণ্ণ হয়ে পড়েছিলাম একসময়। দম বন্ধ হয়ে আসছিল।

একবার ওয়াশিংটন থেকে গ্যারি নামের এক জিজ্ঞাসাকারী এলো। তার সাথে দুইজন মহিলাসহ আরও কয়েকজন আমেরিকানও ছিল। লোকটাকে

দেখতে জাদুকর বা অভিনেতার মতো লাগছিল। আর ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ির কারণে লাগছিল অনেকটা আরবদের মতো। সে এসে খুব কাছ থেকে আমার হাত আর পা পরীক্ষা করে দেখল। যেন কোনো ডাক্তার রোগীকে দেখছে। হাতকড়া পরার ফলে আমার কবজির মাংস কেটে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল সেটা দেখে সে অনেক আফসোস করল। আমার কষ্টের কথা চিন্তা করে সে যেন বিহ্বল হয়ে পড়ল। গার্ডদের নির্দয়তার কথা চিন্তা করে তার হতাশাও ব্যক্ত করল।

আমি বুঝতে পারছিলাম না এই লোকের কাছ থেকে কী আশা করা যায়। শেষ পর্যন্ত সে বলল যে সে আমার জন্য এমন কিছু সংবাদ নিয়ে এসেছে যা শুনলে আমি খুশি হব। সে বলল আমাকে দেওয়ার জন্য তার কাছে পঞ্চাশ লক্ষ ডলার আছে এবং এই টাকা সরাসরি আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে যোগ হবে। এছাড়া আমাকে একটি চমৎকার বাড়ি এবং ব্যক্তিগত গাড়িও দেওয়া হবে। ফলে আমি হব আফগানিস্তানের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি।

আফগানিস্তানে ব্যাপক প্রচলিত ইঁদুর-বিড়ালের শিক্ষামূলক গল্পটির কথা মনে পড়ল আমার। মনে পড়ল, ছোটবেলায় কল্পনায় বিশাল বিশাল প্রাসাদ বানাতাম, কোনো এক সুন্দরীকে বিয়ে করার কথা ভাবতাম। তারপরই শীঘ্রই বাস্তব জগতের কাঠিন্যে ফিরে এলাম।

জিজ্ঞেস করলাম আমাকে এতকিছু দিতে চাওয়ার কারণ কী। সে বলল আমি তাদের খুব কাছের বন্ধু এবং সাহায্যকারী হতে পারি। আমাকে যেসব প্রশ্ন করা হবে তার ঠিক ঠিক উত্তর দিয়ে তাদের সাহায্য করতে হবে। মেনে নিতে হবে আমাকে যা বলবে তার সবকিছুই।

আমি হেসে বললাম, "আমি আলহামদুলিল্লাহ অনেক ধনী। তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না কতখানি ধনী আমি। তোমাদের টাকার কোনো দরকার নেই আমার। আর এতদিন পর্যন্ত আমি যা বলেছি সব সত্যি বলেছি, এবং ভবিষ্যতেও সত্যিই বলব।"

আরও বললাম তাদের দ্বিমুখী আর দ্ব্যর্থবোধক কথার পেছনে লুকিয়ে থাকা অর্থ আমি বুঝি না এবং আমার পক্ষে এ ধরণের ব্যবসা বা প্রতারণা সম্ভব না। স্পষ্ট বলে দিলাম কারও ব্যাপারে তথ্য জোগাড়ে আমি নিজেকে

ব্যবহৃত হতে দেব না এবং এর বাইরে আমার আর বলার কিছুই নেই। আমি কেবল এখান থেকে মুক্তি চাই।

সে জিজ্ঞেস করল, আমি কেন তাদেরকে বিশ্বাস করতে পারছি না।

"এখানে বিশ্বাস করার তো কিছুই নাই," আমি বললাম। "আমাকে শুধু ছেড়ে দাও তোমরা। এর বাইরে আর কিছুই চাই না তোমাদের কাছে।"

চার ঘণ্টাব্যাপী এই দমবন্ধ করা আলোচনা চলল। শেষে সে এঞ্জেল নামের এক বেঁটে মহিলা আর একজন ফার্সী দোভাষীকে রেখে বাকিদের নিয়ে চলে গেল।

মহিলাটা কথা শুরু করল আমি তাকে চিনি কি না জানতে চেয়ে। বললাম, না। সে বলল, তার কী ক্ষমতা আছে তা আমি বুঝতেই পারছি না। বলল, সে এতই ক্ষমতাশালী মহিলা যে, যেকোনো মুহূর্তে আমাকে গ্রেফতার করা বা ছেড়ে দেওয়ার ক্ষমতা তার আছে। সুতরাং আমার জীবন মৃত্যু নাকি এক অর্থে তারই হাতে! মহিলা বলে চলল, সে আমার কাছ থেকে তথ্য বের করার ব্যাপারে এত বেশি সফল হবে যা এর আগে কেউ হয়নি। সে আত্মবিশ্বাসের সাথে বলল, সে একদম প্রথম থেকে সব জিজ্ঞেস করা শুরু করবে এবং সমস্ত সত্য বের করে নিয়ে আসবে। সে নিশ্চিত করবে যে সে যা যা জানতে চাইবে আমি তার সবই জানাব।

আমি বললাম, এর আগের সকলেই প্রথম থেকে শুরু করেছিল একই প্রত্যয় নিয়ে, কিন্তু সবকিছু পরের জনের জন্য ফেলে যাওয়ার চেয়ে বেশি কিছু করতে পারেনি। শুরু করেছে আড়ম্বরের সাথে, শেষ করার কোনো লক্ষণও দেখাতে পারেনি। ফলে না হচ্ছে আমার বন্দীদশার কোনো পরিণতি, না পাচ্ছি আমাদের গন্তব্য সম্পর্কে কোনো তথ্য।

সঙ্গে সঙ্গে মহিলা নির্লজ্জের মতো ক্ষেপে গিয়ে চিৎকার করে আমাকে চুপ করতে বলল। তার কথা শুনতে বলল চুপচাপ এবং বলল আমার এই দম্ভ ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দেখাবে সে। মহিলা আমাকে এত তীব্রভাবে অপমান করল যে আমিও রেগে গেলাম। পাল্টা চিৎকার করে মনে যা আসে তাই বলে ফেললাম। ফলে আলোচনা ওখানেই শেষ হলো এবং তারা আমাকে ওখানে রেখে বেরিয়ে গেল। এরপর ওদের আর দেখিনি।

এসব জিজ্ঞাসাবাদকারীকে আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। তারা এমন ভাব করত যেন আমরা সবাই শিশু, অবুঝ, মূর্খ, অসামাজিক ও নির্বোধ। তারা আমাদের দিয়ে যা বলাতে এবং করাতে চায় তা বোঝার মতো যোগ্যতা আমাদের নেই–এমনই ছিল তাদের মনোভাব। তদন্তকারী আসত আর যেত। নতুনরা এসে সবকিছু আবার নতুনভাবে শুরু করত। একেকজনের আচরণ একেক রকম। কেউ ছিল ভদ্র, শান্ত। কেউ আবার রূঢ়, বৈষম্যকারী। তাদের না ছিল কোনো বোধবুদ্ধি, না জানত তারা পারিপার্শ্বিক বিশ্ব সম্পর্কে কোনো তথ্য। কেউ কেউ ছিল নিতান্ত অভদ্র এবং নির্দয়ভাবে বন্দীদের অত্যাচার করত এমন কিছু অভিযোগে যা তাঁরা করেনইনি।

ক্যাম্পগুলোতে নিয়মকানুনের কোনো তোয়াক্কা ছিল না। গোয়েন্দা কর্মকর্তা, জিজ্ঞাসাবাদকারী, DOC কারা কর্তৃপক্ষ কিংবা প্রত্যেকটা NCO ব্লকের জেনারেল, এমনকি সাধারণ সৈন্য এবং প্রহরী–যে কেউ বন্দীদের সাথে যা ইচ্ছে তাই করতে পারত। বন্দীদের কোনো কথাই শোনা হতো না। একজন বন্দী যত বড় নির্দোষই হোক না কেন, তাঁর কথাকে গুরুত্ব দেওয়ার কেউ ছিল না। সবসময়ই সৈন্য বা গার্ডদের কথাই কানে নিত ওপরের মহল।

যেমন, একবার এক সৈন্য একজন বন্দীর ব্যাপারে নালিশ জানালে সেই বন্দীকে লঘু পাপে এত গুরু দণ্ড দেওয়া হয় যে, অন্য একজন সৈন্য পর্যন্ত একে অন্যায় সাব্যস্ত করে। তবে এই শাস্তি কমানোর ব্যাপারে কোনো আলোচনা আর হয়নি। অজুহাত হিসেবে বলা হয়, সব কাগজপত্র কম্পিউটার সিস্টেমে চলে গেছে এবং একে আর পরিবর্তন করা যাবে না। সেই বন্দীকে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপনেরও কোনো সুযোগ দেয়া হয়নি। আমেরিকানরা এই ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে প্রায়ই আমাদের ওপর অত্যাচার চালাত। অবশ্য বন্দী ভাইদের অনেকেই চেষ্টা করতেন তাঁদের ভাইদের পক্ষে দাঁড়িয়ে ন্যায্য দাবি আদায় করে দিতে।

তবে কেবল ক্যাম্প ফোরে এসে আমি এসব অত্যাচার আর নিপীড়ন থেকে হালকা রেহাই দেখতে পেলাম। এখানকার সৈন্যরা কিছুটা সংযত আচরণ করলেও প্রতি সাত মাস অন্তর একবার করে আমাদের যেতে হয়েছে দীর্ঘ সময়ব্যাপী একেকটা তল্লাশীর ভেতর দিয়ে।

আমাকে বেশ কয়েকজন জিজ্ঞাসাবাদকারীর মুখোমুখি হতে হয়েছে। টম, মাইকেল, আরেকজন টম, জন গ্যারি, মার্গারেট নামের এক মহিলা এবং আরও দুইজন যাদের নাম আমি ভুলে গেছি। আরও কয়েকজনের কথা বলতে পারি–জর্জ, রিচার্ড, ডেভিড, প্রেইড, ম্যারি রবিন এবং মার্সিয়া। বাকিদের নাম মনে নেই।

এদের মধ্যে মাইকেল, প্রেইড, ডেভিড আর জর্জ আমার সাথে সম্মানের সাথে কথা বলেছে। তারা আমাকে কথায় বা আচরণে কষ্ট দেয়নি। শারীরিকভাবেও না। কিন্তু অন্যরা অনেক অত্যাচার করেছে।

মিলিটারি ট্রাইব্যুনাল এবং অনশন

সমুদ্রের একেবারে মাঝ থেকে এবং আমাদের অপহরণকারীদের দয়ার ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হয়ে বাইরের পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছু জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা এবং বিভিন্ন দেশের সরকার আমাদের জন্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল, তার কিছুই আমরা জানতাম না। তবে মোটামুটি ধারণা পেয়েছিলাম যে, আমেরিকান সরকার বিভিন্ন চাপের মুখে আমাদের জন্য নিরপেক্ষ ট্রাইব্যুনাল গঠনে এবং কিছু আইনবিধি মেনে চলতে বাধ্য হয়েছে।

আমাদের একসময় বলা হলো, শীঘ্রই আমরা আদালতে গিয়ে নিজেদের বক্তব্য উপস্থাপন করার সুযোগ পাব। আমাদের 'শত্রুযোদ্ধা' হিসেবে চিহ্নিত করে বলা হলো, এরপর একটি পর্যালোচনা পরিষদের সামনে বসতে হবে। প্রত্যেক বন্দীকে একটি লিখিত নোটিশ দেওয়া হলো, যাতে লেখা আছে যে, তিনি আমেরিকার একজন শত্রু। পর্যালোচনা পরিষদের কাজ হবে কে প্রকৃত শত্রু আর কে সহযোগিতার মনোভাব সম্পন্ন বন্ধু তা বুঝে নেওয়া। যাঁদের শত্রু বলে মনে হবে তাঁদের পাঠিয়ে দেওয়া হবে যুক্তরাষ্ট্রের মূল ভূখণ্ডে। কলম্বিয়ান ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে তাঁদের বিচারকার্য শুরু হবে। এই নরকের মাঝে দীর্ঘদিন থাকার পর আমাদের কেউ কেউ কিছুটা আশাবাদী হয়ে উঠলেন। মনে করলেন এর মাধ্যমে অন্তত তাঁদের দুর্দশার শেষের শুরু হতে যাচ্ছে।

কিন্তু বাস্তবতা হলো, এসব ছিল আরেকটি নিছক প্রহসন। আন্তর্জাতিক মহলকে শান্ত করার জন্য ওরা এমন একটি পদক্ষেপ নেওয়ার ভান করেছে।

এই ট্রাইবুনালের অসারতার একটা নমুনা দেখাই। একজন জিজ্ঞাসাকারী একদিন এসে নিজের পরিচয় দিলো আমাদের রক্ষার প্রতিনিধি হিসেবে। সে আদালতে আমাদের হয়ে কথা বলবে। অন্যদিকে আরেকজন জিজ্ঞাসাবাদকারী রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী হিসেবে কাজ করবে। আর অন্যান্য কয়েকজন সরকারী কর্মচারী সাক্ষী এবং বিচারক হিসেবে থাকবে।

আমাদের সন্দেহ হলো যে এরা সবাই-ই CIA এজেন্ট। আমাদের আর রাষ্ট্রপক্ষের উভয় আইনজীবীই একই সরকারী গঠনতন্ত্র দ্বারা এসে নিযুক্ত হয়েছে। আর এদের কাজ হবে জোর করে কয়েদীদের ভেতর থেকে তথ্য বের করে আনার চেষ্টা করা। কিছুদিন আগেই যেসব বন্দীদের ধরে-বেঁধে এরা অত্যাচার করেছে, আজ কী করে সেই মানুষদের পক্ষে দাঁড়াবে এই লোকগুলো?

আমাকে এক জিজ্ঞাসাবাদকারীর সাথে দেখা করানো হলো, যে কিনা আমার মামলায় রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী। লোকটাকে দেখে রূঢ় এবং বদমেজাজি মনে হয়েছে। আরেকজন এসে নিজের পরিচয় দিলো আমার পক্ষের আইনজীবী হিসেবে। সুতরাং আমি যেন তাকে আমার আগের জীবন এবং কারাজীবন সম্পর্কে সবকিছু খুলে বলি। আমার মনে হয়েছে, এই লোক চাচ্ছিল যেন আমি দোষ স্বীকার বা এমন কিছু করি।

আমি তার কাছে অনুমতি চাইলাম উকিল হিসেবে তার নিজের যোগ্যতা সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করার জন্য। জানতে চাইলাম সে কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে আইন বিষয়ে পড়াশুনা করেছে কি না। সে জানাল, করেনি।

এরপর জানতে চাইলাম–যে বিচারক বোর্ড গঠন করা হচ্ছে, সেই বোর্ডের মামলা চালানোর অভিজ্ঞতা কেমন। এবং এই আদালত কি আমেরিকান আইন নাকি আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী পরিচালিত হবে, তাও জানাতে বললাম। সে বলল কোনো নির্দিষ্ট আইন এখানে প্রযুক্ত হবে না বরং এটা এক বিশেষ মিলিটারি ট্রাইব্যুনাল, যা কেবল শত্রু যোদ্ধাদের বিচারের জন্য স্থাপন করা হচ্ছে।

আমার পরের প্রশ্নগুলো ছিল : তিন বছর কারাবন্দী থাকার পর কেমন করে আমরা এতদিনে এসে 'শত্রুযোদ্ধা' হিসেবে অভিহিত হলাম? 'যুদ্ধবন্দী' হিসেবে আটকে রাখার মাঝখানে কোন যুদ্ধের যোদ্ধা হিসেবে আমাদের উপস্থাপন করতে যাচ্ছে এই আদালত? আর এখানে কি কোনো নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণকারী কেউ আছেন, যিনি দেখবেন যে বিচারকার্য সুষ্ঠুভাবে চলছে কি না? সে আমার এসব প্রশ্নের কোনো উত্তর দিতে পারেনি।

"চমৎকার! তুমি আইন সম্পর্কে কিছুই জানো না।" আমি বললাম। "এমনকি তোমাদের প্রধান বিচারকও আইনের 'আ'-ও জানে না। তিন বছর

আগে আমাদের বিরুদ্ধে তারা অভিযোগ আরোপ করে এখানে নিয়ে এসেছে। তো এখন আর এসব জিজ্ঞেস টিজ্ঞেস করার নাটক সাজিয়ে লাভ কী, হ্যাঁ? তোমরা বল যে আমি অপরাধী, কাগজ এনে স্বাক্ষর করাও তোমাদের শত্রু হিসেবে–তো আর এই ট্রাইব্যুনালে গিয়ে আমার কাজ কী? আমি কোনো ট্রাইব্যুনালের কোনোকিছুতেই সম্মতি জানাচ্ছি না এবং কোথাও শুনানির জন্যও যাচ্ছি না।

"তোমার মতো লোককেও আমার আইনজীবী হিসেবে চাই না আমি। এখন যা ইচ্ছে করতে পারো। যাও, আমার সাথে আর দেখা করতে আসবে না।"

কিন্তু তবু এই মাথামোটা লোকটা জোরাজুরি করতে লাগল যেন আমি তাকে আমার প্রতিনিধি বানাই। বলল, যদি আমি রাজি না হই তাহলে আমার অনুপস্থিতিতেই সে আমার প্রতিনিধিত্ব করবে। আরও কিছুক্ষণ সহ্য করলাম লোকটাকে। তারপর আর না পেরে বললাম, "বলেছি তো যা ইচ্ছে হয় করতে। তোমাকে বা তোমাদের ট্রাইব্যুনালকে বিশ্বাস করার বিন্দুমাত্র সুযোগ আমার নেই। এবং আমি আমার পক্ষে কাউকে দাঁড়ানোর কোনো অধিকারই দিচ্ছি না।"

শেষ পর্যন্ত আমি এতই রেগে গেলাম যে চিৎকার করে তাকে চলে যেতে বললাম। তখন শুধু এর কাছ থেকে মুক্তি পেতে চাইছিলাম। একসময় সে রুম ছেড়ে বের হয়ে গেল।

এতসব হাস্যকর প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাওয়ার পরও ওরা ওদের কাজে আমাদের সহায়তা চাইছিল। এরই মধ্যে আমাদের ওরা যখন শত্রু বলে ঘোষণা দিয়েই ফেলেছে, তখন আর এসব 'অবৈধ' শুনানির প্রয়োজনটাই বা কী? পরবর্তীতে সেই পর্যালোচনা পরিষদের নামকরণ করা হয়–ARB (the Administration Review Board)।

আমিও সেখানে যেতে অস্বীকৃতি জানালাম, ওরাও আমার কাছে আর কোনো নোটিশ পাঠায়নি। আমি থাকাকালে মোটে দুইজন আফগানকে ডেকে পাঠিয়েছিল ওরা। কোনোরকম প্রমাণ ছাড়াই তাঁদের তালিবান এবং আল-কায়েদার সাথে যোগাযোগ রাখার অভিযোগে আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধরত শত্রু সাব্যস্ত করা হয়। এমনকি অনেক বন্দীরই আল-কায়েদা কিংবা

ইসলামিক আমিরাতের সাথে কোনো সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও তাঁদের মুজাহিদ বলে সাব্যস্ত করা হয়। তাঁরা অভিযুক্ত হন তালিবান 'সন্ত্রাসী'দের আশ্রয়প্রদান, খাবার-ওষুধ, বিস্ফোরক এবং অস্ত্র সরবরাহের অভিযোগে। বলা হয় বিখ্যাত মুজাহিদ কমান্ডারদের সাথে তাঁদের যোগাযোগ আছে। অভিযোগ করা হয়, যেসব কমান্ডারদের আমেরিকানরা খুঁজে বেড়াচ্ছে, অভিযুক্তদের তাঁদের সাথে দেখা গেছে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, তাঁদের এটা স্বীকার করতে বাধ্য করা হয় যে, তাঁরা মুজাহিদদের সোয়েটার পরিহিত অবস্থায় গ্রেফতার হয়েছেন।

গ্রেফতার হওয়ার সময় খোশকিয়ার নামের একজনের সাথে একটি আয়না ছিল, আরেক ভাইয়ের কাছে ছিল একটি ফোন, আরেকজন হাতে বাইনোকুলার যা দিয়ে নিজের গবাদিপশুর পালের ওপর নজর রাখছিলেন। আর কারও কারও কাছে অভিবাসী শ্রমিকের পরিচয়পত্র ছিল যা ২৫ বছরের পুরনো। এই হলো কিছু নমুনা যেগুলো দেখিয়ে এত এত নিরপরাধ ভাইকে গুয়ান্তানামোতে আটকে রেখে সীমাহীন অত্যাচার করা হয়েছে।

আমার আশপাশের খাঁচায় থাকা কোনো কোনো ভাই তাঁদের গ্রেফতার হওয়ার পেছনের অসহ্য গল্পগুলো বলেছেন। অযৌক্তিক সব কারণে তাঁদের ধরে আনা হয়েছে। এই ভাইদের কয়েকজন ছিলেন আফগান বন্দী, তৎকালীন সরকারের একজন তালিবান সদস্য, একজন করে মুচি, কামার, রাখাল, সাংবাদিক, দোকানদার, একটি মসজিদের একজন ইমাম, একজন বৃদ্ধ মুজাহিদ এবং তাঁদের নিজস্ব দোভাষী।

আরব বন্দীদের আমেরিকার কাছে বিক্রি করে দিয়েছিল পাকিস্তান। কয়েকজনকে আবার তাঁদের নিজেদের দেশই বিক্রি করেছে। এঁদের কেউ কেউ ছিলেন মুজাহিদ। বাকিরা বিভিন্ন পেশার লোকজন। এমনও কিছু ভাইকে দেখেছি যাঁরা জাতীয় বা আন্তর্জাতিক কোনো একটি বিষয়ে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করার 'অপরাধে' গুয়ান্তানামোতে ঠাঁই পেয়েছেন। যেমন বসনিয়ার শেখ সাবির।

এমনও কিছু পশতু ভাইকে দেখেছি যাঁরা জীবিকা নির্বাহের জন্যই কেবল আরব দেশে কাজ করতেন। বাড়ি যেতেন বছরে, দুই বছরে একবার। ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় তাঁদেরকেও গ্রেফতার করে তুলে দেওয়া হয় আমেরিকার হাতে। কোনো কারণ ছাড়াই টানা তিনটা বছর দুঃসহ

অপমান আর সাজা ভোগ করার পর যাঁরা নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছিলেন তাঁদেরকে একসময় ছেড়ে দেওয়া হয়। সামান্য একটি আয়না পকেটে থাকার ফলে কিংবা মুজাহিদদের একটি কোট গায়ে জড়ানোতে বা মেয়াদোত্তীর্ণ ভিসা সাথে রাখার কারণে এই মানুষগুলোকে গ্রেফতার করে, খাঁচায় বন্দী রেখে তাঁদের জীবনটা একেবারে নষ্ট করে দেয়া হয়েছে।

*

কোনো অন্যায় ঠেকানোর জন্য বন্দীদের কাছে নিজের শরীর ছাড়া আর কোনো অস্ত্র ছিল না। আর সেই শরীর ব্যবহারের একমাত্র উপায় 'অনশন'। আমি থাকাকালেই কয়েকজন আরব ভাইসহ মোট ২৭৫ জন বন্দী আমরণ অনশন শুরু করেন। ২৬ দিনের মাথায় বৃদ্ধ এবং দুর্বল ব্যক্তিরাসহ দুই-তৃতীয়াংশ কারাবন্দী এই আন্দোলনে যোগ দেন। জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী যতদিন না তাঁদের সাথে মানবিক আচরণ করা হচ্ছে ততদিন আন্দোলন চালিয়ে যাবার ঘোষণা দেন তাঁরাও।

আন্দোলন থামাতে এগিয়ে এলো কারা-জেনারেল। কথা দিলো জেনেভা কনভেনশনের সম্ভাব্য কিছু বিধি সে এখন থেকে প্রয়োগ করবে। আমাদের মধ্যকার অন্যতম সম্মানিত এক ব্যক্তি, সৌদি আরবের শেখ শাকেরকে প্রত্যেক বন্দীর কাছে হেঁটে গিয়ে অনশন ভাঙার জন্য অনুরোধ করতে বলা হলো।

তারা আরও বলল বন্দীরা যেন নিজেরা তাঁদের কয়েকজন প্রতিনিধি ঠিক করেন যাঁরা তাঁদের সমস্ত অভিযোগ নিয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারবে। ব্যাপক আলাপ আলোচনা এবং তর্কবিতর্কের পর অনশনের অবসান হলো। ছয়জনকে প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হলো। সেই ছয়জন হলেন–শেখ শাকের, শেখ আবদুর রহমান, শেখ গাসসান, শেখ সাবির, শেখ আবু আলী এবং আমি নিজে।

বব গার্নার কারাগারের একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, কমান্ডার এবং আরও কয়েকজন কর্মকর্তা ৭ই অগাস্ট ২০০৫ আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে আসে। প্রতিনিধি হিসেবে বন্দীদের সমস্যাসমূহের একটি দ্রুত সমাধান বের করা আমাদের দায়িত্ব ছিল। আমাদের ভাইদের কথা দিয়েছিলাম যে আমরা সততার সাথে কাজ করব এবং মার্কিনীদের কোনো ফাঁদে পা দেব না। বব

গার্নার ছিল বেঁটেখাটো, মোটা এক লোক। প্রায়ই সে নিজেকে একজন সিনিয়র শয়তান বলে পরিচয় দিত।

প্রারম্ভিক বক্তব্যে সে বলল, সে চায় ক্যাম্পের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং একারণে আমাদের ছয়জনের সাহায্য তার দরকার। যেহেতু অন্যান্য বন্দীরা আমাদের কথা শুনবে। আরও বলল সে আমাদের সাহায্য করছে এবং আমাদের তরফ থেকে আসা যেকোনো সিদ্ধান্তকে সে সম্মান জানাবে। সে মার্কিন প্রতিরক্ষা সেক্রেটারি ডোনাল্ড রামসফিল্ডের সাথে কথা বলে তাকে জেনেভা কনভেনশনের কিছু ধারা অনুযায়ী আমাদের যথাযথ অধিকার দেওয়ার ব্যাপারেও রাজি করিয়েছে—একথাও জানাল বব।

প্রতিনিধি হিসেবে আমরা সবকিছুই বললাম। আমাদের ওপর অমানবিক আচরণ এবং অত্যাচার বন্ধ করতে হবে, এই দাবি জানালাম। লাগাতার হয়রানী এবং আমাদের ধর্মীয় বিষয়ের প্রতি অবমাননাও যেকোনো মানবাধিকারের লঙ্ঘন, সেটাও বললাম। তাদের মনে করিয়ে দিলাম যে তারা চার বছর যাবৎ কোনোরকম অপরাধের প্রমাণ ছাড়াই নিরীহ লোকদের এখানে আটকে রেখেছে, এখন আবার তাদেরকে 'শত্রুযোদ্ধা' বলে উপস্থাপন করছে। নিরপরাধ লোকদের সাথে এহেন আচরণ মেনে নেওয়ার মতো না। তাঁদের ওপর এই জুলুম বন্ধ করতে হবে।

আমেরিকানরা আমাদের ছয়জনের পক্ষে থেকে দেয়া পরামর্শগুলোকে সম্মান জানাল। বলল তারা এবং জুনিয়র সৈন্যরা আমাদের চাহিদানুযায়ী কাজ করে যাবে।

কিন্তু সবসময় যা হয়, এবারও তাই হলো। কথা দিয়ে কথা রাখার পাত্র এরা না। আমাদের কোনো দাবি মানা দূরে থাকুক, আমাদের ছজনকেই ওরা আলাদা করে ফেলল সবার কাছ থেকে। কারও সাথে আর যোগাযোগ করারও সুযোগ রইল না। কেউ জানতেও পারল না আমাদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে বা কোনো শাস্তি দেওয়া হচ্ছে কি না।

বন্দীরা শীঘ্রই এই তথাকথিত প্রতিনিধি নাটকের ফন্দি ধরে ফেললেন এবং আবারও অনশনে নামলেন। এবার প্রায় ৩০০ জন একসাথে আন্দোলনে জড়িয়ে পড়লেন। এঁদের মধ্যে বিশজন প্রতিজ্ঞা করলেন যে তাঁরা আর কক্ষনো আমেরিকানদের বিশ্বাস করে অনশন ভাঙবেন না, এতে যদি

মরণ আসে, আসুক। সত্যি সত্যিই কয়েকজন মারা গেলেন অনশন করা অবস্থায়! আমেরিকানদের মিথ্যা তাঁদের বিশ্বাস ভেঙে দিয়েছিল।

এবারের অনশনটা দীর্ঘস্থায়ী হলো। এমনকি ২০০৫ এর ১১ই সেপ্টেম্বর আমি মুক্তি পাওয়ার আগ পর্যন্ত তা চলেছে। প্রতিদিনই অনশনকারীর সংখ্যা বেড়েছে। তাঁদের কয়েকজন মৃত্যুর দুয়ার পর্যন্ত পৌঁছেও গিয়েছিলেন। কেউ কেউ এতই দুর্বল হয়ে গিয়েছিলেন যে তাঁরা অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন। তাঁদেরকে কারা হাসপাতালে নিয়ে জোর করে রক্ত দেওয়া হলো। শরীরের এমন অবস্থায়ও তাঁরা রক্ত নিতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছিলেন। চিকিৎসা সামগ্রী ছুঁড়ে ফেলছিলেন, চিকিৎসকদেরও তাঁদের কাছে ভিড়তে দিচ্ছিলেন না। তাঁদের লক্ষ্যই ছিল আমৃত্যু আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া।

পুরো হাসপাতাল রোগী দিয়ে পূর্ণ ছিল। বাহিরে আরও অনেকেই চিকিৎসা নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল। চিকিৎসকরাও সবাই ব্যস্ত ছিলেন জরুরি চিকিৎসা সেবা দেওয়া নিয়ে। এরই মাঝে তাঁদের আদেশ করা হলো অনশনরত রোগীদের জোর করে ওষুধ এবং খাবার প্রয়োগ করার জন্য। এভাবে জোর করে খাওয়ানোর প্রক্রিয়াটা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। তাই কয়েকজন ডাক্তার এই আদেশ অমান্য করলেন। এছাড়া একে তো এটা রোগীর শরীরের জন্য ক্ষতিকর, তার ওপর আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী।

জোর করে খাওয়ানোর এই প্রক্রিয়ায় একটি নল রোগীর নাক বা মুখ এমনকি সরাসরি পেট ফুটো করে পাকস্থলী দিয়ে প্রবেশ করানো হয়। এর ফলে অভ্যন্তরীণ কোনো অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যেহেতু সেখানকার ডাক্তাররা রাজি হননি, তাই পাঁচজন বেসামরিক চিকিৎসককে এই কাজের জন্য নিয়ে আসা হয়। সম্ভবত এ কাজের জন্য তাদের ঘুষ দেওয়া হয়েছিল। যেকোনো শাস্তির মধ্যে এটিই সবচেয়ে মারাত্মক। বন্দীকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে তার শরীরে জোর করে নলটি ঢোকানো হয়।

আফগানিস্তান ইসলামিক আমিরাতে যদি কোনো বিদেশীকে ইসলাম বিদ্বেষী প্রচারণার জন্য গ্রেফতার করা হয়, তাহলে তাকে ইসলামী আইন অনুসারে সমস্ত সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়। দর্শনার্থীরা চাইলে তার সাথে দেখা করতে পারে, সে নিজ পছন্দমতো আইনজীবী নিয়োগ দিতে পারে তার পক্ষে লড়বার জন্য। দুইজন আমেরিকান জিম্মির কথা আমি জানি। কেউ

তাদের সাথে অন্যায় আচরণ করেনি। এমনকি সাংবাদিকরাও এসে তাদের সাক্ষাৎকার নিয়ে গিয়েছিল।

জাতিসংঘ আফগানিস্তানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে, যার ফলে সরাসরি দুই কোটি আফগান জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এদিকে আমেরিকা হাজার হাজার নিরপরাধ মুসলিমকে ধরে নিয়ে বিনা বিচারে আটকে রেখেছে। জাতিসংঘ এঁদের মুক্ত করতে বরাবরই ব্যর্থ হয়েছে। তাঁদের কান্নার শব্দ এই প্রতিষ্ঠানের কান পর্যন্ত পৌঁছায় না। গুয়ান্তানামো কারাগারের মতো অন্ধকার, অত্যাচারে পূর্ণ কারাগারগুলো বন্ধ করার একের পর এক প্রতিশ্রুতি ফাঁকা বুলিতে পরিণত হয়েছে বারবার। বিশ্বের সবচেয়ে হিংস্র জাতিটিকে সামলাতে জাতিসংঘ সত্যিকার অর্থেই ব্যর্থ হয়েছে।

*

গুয়ান্তানামো কারাগারের উদ্দেশ্য কী ছিল? ন্যায়বিচার স্থাপন অবশ্যই না। তাহলে? পরপর দুইজন মার্কিন প্রেসিডেন্ট কী করে পারল সমস্ত আন্তর্জাতিক আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে মানবতাবিরোধী এমন জঘন্য অন্যায় চালিয়ে যেতে?

বুশের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ইরাককে ধ্বংস করেছে। এই যুদ্ধের পেছনে অজুহাত ছিল–ইরাকের কাছে নাকি ভয়াবহ গণহত্যা চালানোর মতো অস্ত্র মজুদ আছে। সম্পূর্ণ বানোয়াট এক দাবি ছিল এটা। আর এরচেয়েও নিকৃষ্ট মিথ্যার ধূম্রজাল বানিয়ে আফগানিস্তানে হামলা চালানো হয়েছিল। বুশের উত্তরাধিকারী হয়ে এসে বারাক ওবামাও গুয়ান্তানামো কারাগার বন্ধের ব্যাপারে দেওয়া তার সমস্ত নির্বাচনী-প্রতিশ্রুতিকে পাশ কাটিয়ে গেছে দীর্ঘদিন। যে বছর আমাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল, অর্থাৎ ২০০২ সালের জানুয়ারি থেকে ৭৭৯জন নিরপরাধ মানুষকে কোনো মামলা ছাড়াই ওখানে নিয়ে বিনা বিচারে আটকে রাখা হয়েছে। ইরাক এবং আফগানিস্তান ধ্বংসে সাহায্য করা দেশগুলোও এই কারাগার নির্মাণের গোপন আঁতাতকারী।

গুয়ান্তানামোতে আমাদের ওপর নির্যাতন চালানো হয়েছে, অপমানিত করা হয়েছে এবং আমাদের সবধরনের সামাজিক যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা হয়েছে। আমাদের জোর করে খাবার খাওয়ানো হয়েছে এবং সমস্ত মেডিকেল ও নৈতিক আইনের পরিপন্থী কাজ ওরা করেছে। এসব কাজ ওরা

এখনও করে যাচ্ছে যেন মুসলিমরা নিজেদের 'সন্ত্রাসী' বলে স্বীকারোক্তি দিতে বাধ্য হয়। আমাদের জানামতে সেখানে অত্যাচারের ফলে নয়জন মানুষ মারা গিয়েছেন। আরও অনেককে আমরা হারিয়েছি অত্যাচারের ফলে তাঁরা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেওয়ায়। বিশজনেরও বেশি শিশু, যাদের বয়স ১৩ বা তার কাছাকাছি, আমেরিকানদের মিথ্যার জালে ফেঁসে গিয়ে ওখানে বন্দী আছে। বাচ্চাগুলোর সাথেও ওরা দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসীর মতো আচরণ করেছে।

গুয়ান্তানামো বে কারাগার আজও মানবতার এক ক্ষত হিসেবে টিকে আছে। শত আন্তর্জাতিক চাপের পরও সেখানে ১৫৮ জন বন্দী অবস্থায় আছেন[৪]। এই কারাগারের গোপন পাপের কিছু প্রমাণ যেহেতু এরই মধ্যে ফাঁস হয়ে গেছে, তাই এখন আমেরিকার উচিত নিজেদের মুখ বাঁচানোর পথ খোঁজা; সমগ্র মানবতার স্বার্থে সেখানে যা যা হয়েছে সবকিছু স্বীকার করে নেওয়া।

২০০৭ সালের জুন মাসে বারাক ওবামা গুয়ান্তানামো বন্ধের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। ২০০৯ সালে তার স্বাক্ষরিত এক আদেশনামায় ২০১০ সালের ২২শে জানুয়ারির মধ্যে এই কারাগার বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত ১০০ এরও অধিক নির্দোষ ব্যক্তি 'সন্ত্রাসী' তকমা গায়ে লাগিয়ে ওখানে বন্দী আছেন এবং আদালতেও তাঁদের বিরুদ্ধে কিছু প্রমাণিত হয়নি।

ইতিহাস কারাগারটির কথা মনে রাখবে আমেরিকার হিংস্রতার প্রমাণ হিসেবে। মনে রাখবে দুর্বল এবং অসহায়দের সাথে দেশটির আচরণের জন্য। মুসলিমদের বিরুদ্ধে এসব আগ্রাসনের নেতিবাচক প্রভাব আমেরিকার ওপর পুরো বিশ্বজুড়ে পড়বেই। জাতিসংঘও জেনেভা কনভেনশনকে অমান্য করেছে। রোম স্ট্যাচুর অনুসমর্থনও তারা দেয়নি। এত এত আইন যেন কেবল অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশের জন্যই তৈরি করে রাখা হয়েছে। ক্ষমতাশালী রাষ্টগুলোকে কখনোই তাদের অন্যায়ের জন্য বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়নি। এতে তো এটাই প্রমাণিত হয় যে টাকা আর ক্ষমতা থাকলে বিশ্বের যেকোনো আইন কিনে ফেলা যায়!

---

৪. বইটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশ হওয়ার সময় পর্যন্ত ৪১ জন এখনো বন্দী আছেন।

আপনি যদি চান আমেরিকা কেন বিশ্বজুড়ে এত ঘৃণিত তার মূল কারণ বের করবেন, তাহলে এই একটি কারাগারের দিকে তাকালেই হবে। এতসব গ্রেফতার, নির্যাতন এবং ভেঙে যাওয়া নিঃস্ব পরিবারগুলো কীভাবে বেঁচে আছে তার দিকে তাকান। এসব দেখতে দেখতে আরেকটি জিনিস আপনার চোখে পড়বে, আর তা হলো, এগুলোর মাধ্যমে আমেরিকা তার পতন ডেকে এনেছে। তথাকথিত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে দেশটি অবিবেচকের মতো নিরীহদের ওপর অত্যাচার চালিয়ে তাঁদের অন্তরকে ঘৃণা দিয়ে পুরে দিয়েছে। হিংস্রতার হাত ধরে কেবল হিংস্রতাই আসে।

অবশেষে মুক্তি

২০০৪ সালের ১১ই মে, রমজান মাসের ১৬ তারিখ আমাকে আরও একবার জিজ্ঞাসাবাদ কক্ষে নিয়ে যাওয়া হলো। আশ্চর্য! এই কক্ষ তো সেই কঠিন, ভয় জাগানিয়া কক্ষটি না। সেই কক্ষে আমাদের মেঝের সাথে বা একটি টেবিলের সাথে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হতো। এই রুমটা তুলনামূলক চমৎকার। কিছু আসবাবপত্র, কোণায় একটি টেলিভিশনও আছে। প্রথমবারের মতো আমার হাত এবং পায়ে কোনো বাঁধন নেই।

এখনও বুঝতে পারছি না কী আশা করা যায় এখান থেকে। কিছুক্ষণ পর একজন আফগান এলেন। তাঁর সাথে আমাকে আগে জিজ্ঞাসাবাদ করা দুইজন এবং অপরিচিত আরও একজন সহ মোট তিনজন আমেরিকান প্রবেশ করল। সেই তৃতীয় ব্যক্তি বলল সে আফগানিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত।

আফগান ব্যক্তিটি বললেন যে তিনি আফগান সরকারের প্রতিনিধি। তিনি আমাকে বিনীতভাবে অভিবাদন জানালেন। কিন্তু এতদিনে আমি এখানকার যেকোনো কিছুকেই আর এক কথায় বিশ্বাস না করতে শিখে গেছি। সন্দেহ হলো লোকটা সত্যি সত্যিই সরকারের প্রতিনিধি কি না। তবু আমি তাঁর সাথে কিছু কথাবার্তা বললাম এবং তার সহমর্মিতা দেখে অবাক হলাম। এর আগের সমস্ত প্রতিনিধিই ছিল আক্রমণাত্মক, দেখিয়েছিল আমেরিকার একান্ত পা-চাটা গোলামী। কিন্তু এই ব্যক্তি তাঁর দেশের একজন নাগরিকের কোনোরকম সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকার বিন্দুমাত্র প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও এভাবে বন্দী থাকার কারণে আন্তরিক শোক ও গভীর দুঃখ প্রকাশ করলেন।

আরেকদিন আমাকে দুপুরের খাবারের জন্যও আমন্ত্রণ জানিয়ে সুস্বাদু খাবার আর ফলও পরিবেশন করা হলো। গ্রেফতার হওয়ার পর থেকে এমন ঘটনা এবারই প্রথম। এসব সম্ভবত সেই প্রতিনিধি আমাকে যে শ্রদ্ধা দেখিয়েছিলেন তার প্রতিফলনেই ঘটছে। সেদিনের আলোচনায় একটি

প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলাম–গুয়ান্তানামো থেকে আমার মুক্তি নিশ্চিত করার ব্যাপারে। কিন্তু আমেরিকানরা যেমন, তেমনই রয়ে গেল। কিছুই হয়নি।

প্রতীক্ষায় আরও এক বছর কেটে গেল। এই সময়ে জিজ্ঞাসাবাদকারীরা আমাকে সপ্তাহে দুইবার করে ডেকে পাঠাতে লাগল। কিন্তু এবারে তাদের আচরণ যথেষ্ট মার্জিত। আমাকে খাবার সাধতে লাগল, বলল যা ইচ্ছে হয় চাইতে পারি। বছরের পর বছর যাবৎ পশুর চেয়েও বাজেভাবে আমার সাথে দুর্ব্যবহার করার পর ওরা আমাকে মানুষ ভাবতে শুরু করেছে। কিন্তু আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গেছে যে এত এত আদর আপ্যায়নের নাটকের পেছনে নিশ্চই তাদের কোনো স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্য আছে। এতদিন ধরে ওদের কর্মকাণ্ড এর চেয়ে ভালো কিছু ভাবতে শেখায়নি আমাকে।

আমার সাথী ভাইদের তখনও মারধোর করে যাচ্ছে ওরা। দিচ্ছে খাবারের কষ্ট। অথচ আমাকে আলাদা করে এনে বাড়তি যত্ন নেওয়া হচ্ছে। অনুশোচনা আর অপরাধবোধ এমনভাবে আমাকে ঘিরে ধরল যে আমি যা পেরেছি সব আমার ভাইদের সাথে ভাগাভাগি করে নিয়েছি। আমার জীবনযাপনের অবস্থাও পাল্টে গেল। দেওয়া হলো সুগন্ধি, শ্যাম্পু, ভালো মানের অলিভ অয়েল। আমার ভাইদের সাথে এগুলোও ভাগ করে নিলাম। নিজের ভাইদের ক্ষুধার্ত রেখে কী করে একজন মুসলিম খেতে পারে?

সেই আফগান প্রতিনিধি আমাকে বলে গিয়েছিলেন, একমাসের মধ্যেই তিনি আমার মুক্তির সংবাদ নিয়ে ফেরত আসবেন। কিন্তু যখনই মাস গড়িয়ে দ্বিতীয় মাসে পড়েছিল তখন থেকেই সন্দেহ আমার মনে দানা বাঁধতে থাকে। যদিও ওখানকার কর্তাব্যক্তিরা আমাকে বারবার আশ্বাস দিয়েই যাচ্ছিল।

২০০৫ সালের পহেলা নভেম্বর আমাকে বলা হলো যে আমি মুক্তি পেতে যাচ্ছি। সেই প্রতিনিধি আসছেন এবং তিনি আমাকে দেশে নিয়ে যাবেন। প্রথমে আমাকে এখান থেকে অন্য কোথাও নেওয়া হবে, তারপর আমি যাব আমার প্রিয় স্বদেশে।

অবশ্যই এসব শুনে আমি তেমন উদ্বেলিত হইনি। যারা আমাকে আটকে রেখেছে তাদের তো আর এখন বিশ্বাস করি না। তাদের কথার সত্য-মিথ্যা পার্থক্য করা বেশ কষ্টকর। কয়েকজন সাথি ভাইও বলতে

লাগলেন, আমেরিকানরা নতুন কোনো পরিকল্পনা আঁটছে। আশা দিয়ে দিয়ে শেষে সব মিথ্যা প্রমাণ করে আমাকে ওরা মানসিকভাবে ভেঙে দিতে চায়।

কেউ কেউ অবশ্য অবাক হয়েছিল। তারা পীড়নে আছে, এর মাঝে আমি কীভাবে মুক্তি পাচ্ছি! সেখানে এমন কিছু বন্দীও ছিল যারা আফগান সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের সদস্য। তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, ঘুষগ্রহণ এবং সরকারী সম্পদ লুঠ করার অভিযোগ ছিল। এই লোকগুলোর বিবেকবোধও অত সক্রিয় না, তাই তারা আমেরিকার সাথে তাদের সম্পর্ক নিয়ে উচ্চবাচ্য করতে লাগল। তারা প্রায়ই বলত আমেরিকানরা তাদেরকে বড় বড় চাকরি দেবে। তারা মোটামুটি নিশ্চিত ছিল যে আমরা, বাকিরা, পুরোটা জীবন এসব খাঁচায় বন্দী থেকে কাটাব।

আমি কেবল কাঁধ ঝাঁকালাম। বললাম, "আলহামদুলিল্লাহ। আমি মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ আমার জীবন এবং দ্বীনের জন্য। এবং এজন্য যে অন্ততপক্ষে আল্লাহর দ্বীন মানার এবং রক্ষার জন্য আমার এই কারাবরণ। আলহামদুলিল্লাহ আমি আমার দেশ এবং ইসলামের সাথে ন্যূনতম বেইমানি করিনি এবং আপনারা যে দণ্ডনীয় খাতিরের কারণে বড়াই করেন তা থেকেও আল্লাহ আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। না হয় এই জেলজীবন আমার জন্য কেবল হতাশারই হতো।"

পরের সপ্তাহও কেটে গেল। কিন্তু সেই আফগানীর কোনো চিহ্নও দেখলাম না। এই ইঁদুর বিড়াল খেলার পরের ধাপ নিয়ে ভাবতে গিয়ে আমি শঙ্কিত হয়ে পড়লাম।

নতুন কক্ষে এসে চাহিদানুযায়ী মোটামুটি সবই পেলাম। কার্পেটে মোড়া মেঝে, একটি টেলিভিশন, একটি এসি, একটি কফি মেকার, টাটকা ফল এমনকি আলাদা একটি বাথরুম–যেখানে নতুন সাবান আর শ্যাম্পু রাখা। সব দেখে ভীষণ আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলাম। খাঁচায় আবদ্ধ থেকে কেবল একটি খালি স্টিলের বিছানায় কয়েক বছর কাটিয়ে এসে প্রায় একই জায়গায় এ ধরনের সুবিধা পাওয়া তো একেবারে কল্পনারও বাইরে। বাড়ি থেকে তুলে আনার পর এবারই প্রথম আমি নিজ হাতে এক কাপ গ্রিন-টি বানালাম। এর জন্য বছরের পর বছর যে কত তীব্রভাবে অপেক্ষায় ছিলাম। শোকর আলহামদুলিল্লাহ, একটি সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা পূরণ হলো।

একটু পর কয়েকজন জিজ্ঞাসাবাদকারী এবং একজন জেনারেল এসে আমাকে শুভেচ্ছা জানাল। বলল শীঘ্রই আমি মুক্তি পেতে যাচ্ছি। সেই আফগান প্রতিনিধি পরদিনই চলে আসার কথা। আবারও সেই পুরনো ভয় আর সন্দেহ আমাকে ঘিরে ধরল। একই সাথে ভীষণ অনুশোচনাবোধ আমাকে গ্রাস করে ফেলল। নিজের ভাইদের এই জাহান্নামে রেখে আমি কিনা মুক্ত হয়ে যাওয়ার আশায় দিন গুনছি! আমার ভাইরা যখন কারাগারে বন্দী থাকবে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাওয়া গলায় আর ক্ষুধায় লেগে আসা পেট-পিঠে, যখন তাঁরা নিজেদের জীবন নিয়েই থাকবেন অনিশ্চিত, যখন তাঁদের সমস্ত মানবিক অধিকার আর সম্মান ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হবে প্রতিনিয়ত, তখন আমি থাকব মুক্ত-স্বাধীন, পরিবারের মাঝে–এই আশা কিনা আমাকে আনন্দিত করছে!

যাইহোক, সমস্ত অনিশ্চয়তা কাটিয়ে পরদিন সেই প্রতিনিধি এলেন। তিনি আমাকে আমার পরিবার এবং দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে কিছু সংবাদ জানালেন। জানালেন, পরদিন মাঝরাতে এক ফ্লাইটে করে আমাকে নিয়ে যাওয়া হবে, তাই আমার এখন খানিক বিশ্রাম নেওয়া উচিত।

কিন্তু আমি অন্যায়ভাবে আটক থাকা আমার সেই ভাইদের ব্যাপারে উদ্বেগ এবং দুঃখবোধের কথা না জানিয়ে থাকতে পারলাম না। রাজনৈতিক নীতিনির্ধারণী ব্যক্তিদের জ্ঞাতসারেই এখানে আমাদের ওপর কী কী অত্যাচার চালানো হয় তার যতটুকু পারি সেই প্রতিনিধির কাছে তুলে ধরলাম। কোনোপ্রকার আইননানুগ বা মানবিক সাহায্য না পেয়ে বন্দীরা মানসিক এবং শারীরিকভাবে একেবারে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছেন। কোনো কোনো ভাইকে এত জঘন্যভাবে মারা হয়েছে যে তাঁরা নিজেদের মৃত্যু কামনা পর্যন্ত করেছেন! এই সবকিছু আমি তাঁকে জানালাম। তিনি আশ্বাস দিলেন, ব্যাপারগুলো তিনি আমেরিকানদের সাথে আলোচনার সময় উত্থাপন করবেন।

আমাকে আবারও সেই খাঁচায় নিয়ে যাওয়া হলো যেখানে আমি বন্দীজীবনের বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছি। আবারও তালাবদ্ধ অবস্থায়, আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম কখন রেড ক্রিসেন্ট এসে জিজ্ঞেস করবে–আপনি কি নিজ দেশে ফিরে যেতে চান?

রেড ক্রিসেন্টের পরিবর্তে হঠাৎ একদল আমেরিকান এলো। ওদের হাতে একটি ভিডিও ক্যামেরা। আর সাথে একজন পশতু দোভাষী। পশতু লোকটার হাতে ইংরেজিতে লেখা কিছু কাগজ। সম্ভবত এগুলো পশতু ভাষায় অনুবাদ করে শোনাবে সে। দোভাষী লোকটি বলল যে, এগুলো কিছু লিখিত শর্ত যা মুক্তি পাওয়ার আগে আমাকে মেনে নিতে হবে।

বুঝলাম, কয়েক মাঘেও শীত যাচ্ছে না। আমাকে বলা হলো জোরে জোরে শর্তগুলো পড়তে। তারপর সেই কাগজে নিজের সম্মতি জানিয়ে স্বাক্ষর করতে।

যুক্তরাষ্ট্রের আরোপকৃত শর্তসমূহ নিম্নরূপ :

১. এই অপরাধী তার সব অপরাধ স্বীকার করে নিচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাছে তার কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চাইছে এবং তাকে ক্ষমা করে মুক্ত করার জন্য সে সরকারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে।

২. এই বন্দী আল কায়েদা এবং তালিবান আন্দোলনের একজন সক্রিয় সদস্য। সে সংগঠনটির সাথে সবরকমের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার ব্যাপারে সম্মতি জানাচ্ছে।

৩. বন্দী প্রতিজ্ঞা করছে যে সে আর কখনো কোনোপ্রকার সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়াবে না।

৪. এই বন্দী আরও প্রতিজ্ঞা করছে যে সে কক্ষণো কোনো ধরনের জোট-বিরোধী বা আমেরিকা-বিরোধী কর্মকাণ্ডে অংশ নেবে না।

৫. যদি আসামী উপর্যুক্ত অপরাধগুলোর কোনো একটির সঙ্গে জড়িত হয়, তাকে আবারও গ্রেফতার করা হবে এবং চিরতরে বন্দী করে রাখা হবে।

আসামী সবকিছু মেনে নিয়ে তার স্বাক্ষর প্রদান করল।

শর্তগুলো দেখে আমি ভাষা হারিয়ে ফেললাম। উর্ধ্বতন কয়েকজন আমেরিকান এবং সেই সৈন্যরা ভিডিও ক্যামেরা চালু করে আমার স্বাক্ষরের অপেক্ষা করছে। আর আমার স্বাক্ষর পেয়ে গেলেই তারা গুয়ান্তানামোতে

আমার ওপর চালানো সমস্ত অন্যায় অবিচারের যে কোনো দায়দায়িত্ব বা দোষারোপ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

আমার নিজেকে শত্রুযোদ্ধা হিসেবে স্বীকার করে নেওয়ার প্রক্রিয়াটি তারা রেকর্ড করছে। ওরা সাইন করার জন্য কাগজটা আমার দিকে ঠেলে দেওয়ার সময়ও আমি চুপ করে থাকলাম। কয়েক মুহূর্ত পর রাগের সাথে কাগজটা ওদের দিকে ছুঁড়ে মেরে তাদের সব প্রশ্নের জবাব দিতে শুরু করলাম,

"আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ," উত্তেজিত কণ্ঠে বললাম আমি। "আমি অপরাধী নই। এখানকার একটি শর্ত এবং অভিযোগও আমি কখনোই মেনে নেব না। অবৈধভাবে আমাকে কারাবন্দী করায় আমি কখনোই তোমাদের ক্ষমা করব না। আর তোমাদের কাছে ক্ষমা চাওয়ার তো প্রশ্নই আসে না। তাহলে কেন আমাকে ছেড়ে দেওয়ার কারণে তোমাদের ধন্যবাদ জানাব, হ্যাঁ? কোনো আদালতের সামনে পেরেছ আমার একটা অপরাধও প্রমাণ করতে? কোন আদালতে আমার বিচারকার্য চলেছে পারলে আমাকে দেখাও।

আমি একজন তালিব। মানে বোঝো এর? এর মানে জ্ঞানসাধক। আমি তালিব ছিলাম, থাকব। আর-আল কায়েদার কথা বলছ? আমি আল-কায়েদার সদস্য না।" এক নাগাড়ে কথাগুলো বলে ক্ষণকাল থামলাম।

তারপর আবারও জানতে চাইলাম কোন অপরাধটা আমি করেছি, এবং ঠিক কোন অপরাধ আমি আবার করতে পারি বলে ওরা ভয় পাচ্ছে। তাদের কাছে এমন কর্মকাণ্ডের কী প্রমাণ আছে? নিজের রাগ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল এবং আমি চিৎকার করে জানতে চাইলাম, "বল, কোন অপরাধ করেছি আমি? কোন অপরাধ?! আফগানিস্তান আমার নিজের বাড়ি। কারও অধিকার ছিল না আমাকে বাড়ি থেকে তুলে আনার এবং বাড়ি ফিরে যেতে না দেওয়ার। তোমরাই আমার স্বাধীন সার্বভৌম দেশে হানা দিয়েছ। আর এখন তোমরা বলে দেবে আমি দেশে ফিরে যাব কি যাব না? হেহ।"

এরপর একটু বিরতি দিয়ে আবার স্বাভাবিক গলায় বলতে লাগলাম, "আমি এই উদ্ভট কাগজে স্বাক্ষর করি আর নাই বা করি, তোমরা আমাকে অযথা কারারুদ্ধ করে রেখেছ। এবং ইচ্ছে হলেই আবারও গ্রেফতার করে সন্ত্রাসী আখ্যা দিতে পার, যেহেতু মিথ্যে বলার বেশ ভালো অভ্যাস আছে

তোমাদের। আইন এবং সুবিচারের প্রতি তোমাদের কোনোই বিশ্বাস নেই। সুতরাং কোনো কাগজ টাগজে আমি স্বাক্ষর করছি না।”

তারা বলল যে স্বাক্ষর না করলে আমি মুক্তি পাব না।

বললাম, “আজীবনও যদি জেলে পঁচতে হয় তবু আমি এমন কাগজে স্বাক্ষর করব না। নিজেকে একজন ক্রিমিনাল বলে স্বীকৃতি দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব না।”

তারা খাঁচা ছেড়ে চলে গেল এবং একটু পর আবার ফিরে এলো। কিন্তু আমি আমার কথায় অনড় রইলাম। শেষমেশ ওরা বলল যেন আমি লিখে দিই যে, আমি এ শর্তগুলো মানতে রাজি না এবং কেন রাজি না তা-ও যেন লিখে দিই। এবার আমি আমার নিরীহতার ব্যাপারে যা করা দরকার তা করবার অনুমতি পেলাম। তাই কলম নিয়ে লিখলাম–

“আমি অপরাধী নই। আমি একজন নিরপরাধ ব্যক্তি। পাকিস্তান এবং যুক্তরাষ্ট্র আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। কোনো সুস্পষ্ট অভিযোগ ছাড়াই আমি চার বছর কারারুদ্ধ আছি। আমি লিখিত প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, আমি কখনোই আমেরিকা বিরোধী কোনো কাজে জড়াব না। ওয়াসসালাম।”

এর নিচে আমার স্বাক্ষর দিলে তারা কক্ষ ছেড়ে চলে যায়।

আমি বুঝতে পারছি না ওরা আমার বক্তব্য গ্রহণ করেছে কি না। কিছুক্ষণ পর রেড ক্রিসেন্টের প্রতিনিধিরা এসে আমাকে মুক্তি পাওয়ায় অভিনন্দন জানাল। তারা জানতে চাইল আমি আফগানিস্তানে ফিরে যেতে সম্মত হয়েছি কি না। আমি পাল্টা জিজ্ঞেস করলাম যে, যদি আমি ফিরে যেতে রাজি না হতাম তাহলে তারা আমাকে কীভাবে সাহায্য করত। আমাকে কি এই কারাগারেই বাকি জীবনটা কাটাতে হতো? তারা বলল তাদের হাতে আসলে কিছুই নেই। সবই নির্ভর করে আমেরিকানদের ইচ্ছার ওপর।

সত্যি বলতে, আমাকে সাহায্য করার কোনো ক্ষমতাই তাদের নেই। আফগানিস্তান আমার বাড়ি। আমি দেশটাকে ভালোবাসি। আমি বুঝতে চেষ্টা করলাম ওরা কেন জানতে চাইছে আমি অন্য কোথাও যেতে চাই কি না। জানতে ইচ্ছে হলো, তারা কি আমাকে আমার বাড়ি থেকে দূরে কোথাও রাখতে চাইছে?

আমেরিকার কীসের এত কর্তৃত্ব? তারা কেবল নিজেদের পরিকল্পনাকে জায়েজ করে নেওয়ার জন্যই রেড ক্রিসেন্টের প্রতিনিধিদলকে আমার সাথে সাক্ষাতের জন্য পাঠিয়েছে। এদিকে আমেরিকার হস্তক্ষেপ ছাড়া রেড ক্রিসেন্টেরও করার কিছু নেই। তারা এমনকি বন্দী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নেও কোনো ভূমিকা রাখতে সক্ষম না।

আমাকে ক্যাম্প ডেল্টায় নিয়ে যাওয়া হলো বন্দীদের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার জন্য। আমার ভাইদের তাঁদের জীবন্ত কবর থেকে উঠিয়ে এনে এক বড় খাঁচায় জড়ো করা হয়েছে। আমি তাঁদের সাথে কথা বললাম। দেড় ঘণ্টা ধরে কথা বললেন আমার সাথে। নিজেদের ব্যথা ভাগাভাগি করে নিলাম। ভালোবাসার বার্তা জানিয়ে বিদায় নিলাম।

তাঁদেরকে ছেড়ে আসছি। হৃদয় ভারী হয়ে আছে তাঁদের জন্য দুঃখ-কষ্টে। আমার এই মুক্তি লজ্জার। আমার মুসলিম ভাইয়েরা দুর্বিষহ এক জীবন যাপনের জন্য এখনও পড়ে আছেন, জানেন না এর শেষ কোথায়, তবু আমার মুক্তিতে তাঁরা আনন্দিত।

এরপর গেলাম ভয়ানক ক্যাম্প ফাইভে। ওখানে শুধু আফগান ভাইদের সাথে দেখা করার অনুমতি মিলল। তারপর নিয়ে যাওয়া হলো প্রথম ক্যাম্পে। সেখানেও শুধু আফগান ভাইদের কাছ থেকেই বিদায় নেয়ার সুযোগ পেলাম। ক্যাম্প ফোরে এসে আরব, আফগান সবার সাথেই দেখা করলাম। বিদায় জানালাম।

সবশেষে সেই কক্ষে ফিরে এসে রাতের খাবার খেলাম। এগারোটা বেজে গেছে এতক্ষণে। ইশা আদায় করে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিলাম। রাত প্রায় একটা, আমাকে ডেকে তোলা হলো। একটি গাড়িতে করে বিমানবন্দরে নিয়ে যাওয়া হলো, হাত এখনও আগের মতোই শিকল দিয়ে বাঁধা। গাড়ির দরজা খোলার পর রিজিওনাল জেনারেল সৈন্যদের আদেশ দিলো হাতের তালা খুলে দিয়ে গাড়ি থেকে বের করে আনতে।

পুরো বিমানবন্দরের সব লাইট বন্ধ। একটি বিমান ওড়ার জন্য অপেক্ষা করছে। আমাকে সেটার কাছে নিয়ে যাওয়া হলে দেখলাম কয়েকজন আমেরিকান দাঁড়িয়ে আছে। তাদের পাশে কয়েকজন আফগানও আছেন, যাঁরা আমাকে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করতে এসেছেন। মুক্তি পাওয়ার জন্য

আফগানরা আমাকে এসে অভিবাদন জানালেন এবং বিমানে চড়ে বসতে বললেন। গ্রেফতার হওয়ার পর থেকে এবারই প্রথম আমি নিজে নিজে হাঁটছি। কাঁধে হাত রেখে কোনো সৈন্য ধাক্কা দিচ্ছে না।

এটি ছোট একটি জেট প্লেন, যা আফগান প্রতিনিধিদল দ্বারা সনদপ্রাপ্ত। জেনারেল প্লেনে উঠে এসে বিদায় জানাল। আমাদের সাথে আছে আরও চারজন আমেরিকান, যাদের দেখে নিরাপত্তা কর্মকর্তা মনে হচ্ছে। রাত প্রায় তিনটার দিকে প্লেন আকাশে উড়ল।

আফগান প্রতিনিধি আমার জন্য আফগানি ঐতিহ্যবাহী পোশাক এবং তুরবান নিয়ে এসেছেন। আমি ইচ্ছেমতো প্লেনে হাঁটতে পারছি, টয়লেটে যেতে পারছি। খাবার, ফল খেতে পারছি, চাইলেই ঘুমুতে পারছি। বিরক্ত করার কেউ নেই। দশ ঘণ্টার যাত্রা শেষে আমরা ইংল্যান্ডে নামলাম তেল ভরার জন্য। এরপর কাবুল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত পৌঁছতে আরও সাত ঘণ্টা লেগে গেল।

এই চার বছরে কাবুল অনেকাংশেই বদলে গেছে–বিশেষত বিমানবন্দর। আমেরিকানরা নিরাপত্তাবেষ্টিত অনেকগুলো সড়ক তৈরি করেছে এখানে। এটি যেন এখন একটি ছোট শহর। মাটিতে নেমে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করলাম–সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। অবশেষে আমি বাড়ি ফিরেছি।

শেকলে বন্দী অবস্থায় আমি প্রায়ই এই মুহূর্তের অপেক্ষায় থাকতাম। সেই ভূমিতে এসে প্রাণভরে শ্বাস নেওয়ার স্বপ্ন দেখেছি কতদিন, যে ভূমি থেকে আমাকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল চার চারটি বছর আগে।

*

এই স্মৃতিচারণ যখন করছি, যেখানে বসে লিখছি, তখন আমি আছি খোশাব মিনা-তে। প্রায় পাঁচ মাস যাবত এখানে আছি। সরকারের ভাড়া করা এক বাসায় থাকি। আমার পরিবারের সাথে আবার একত্র হয়েছি। সরকার আমার নিরাপত্তার বিষয়টি দেখছে। সাথে এখানে থাকার জন্য কিছু শর্তও জুড়ে দিয়েছে, তবে আশা করছি এক বছরের মধ্যেই এসব শর্ত তুলে নেওয়া হবে।

পাঠকদের কাছে অনুরোধ করছি, আমাদের জন্য দুআ করুন। দুআ করুন আপনাদের সেই সমস্ত ভাইবোনদের জন্য যাঁরা দীর্ঘদিন যাবৎ অন্ধকার কারাগারে অবরুদ্ধ হয়ে আছেন, নির্যাতিত হচ্ছেন অন্যায়ভাবে। আল্লাহ তাআলা সবরকমের শয়তানী কূটচাল এবং বিপদাপদ থেকে আমাদের রক্ষা করুন। আল্লাহ আমাদেরকে শীঘ্রই চূড়ান্ত বিজয় দান করুন। আমিন।

*

১১ই জুন, ২০০৬ তারিখে এক দুঃসংবাদ পাই আমি। গুয়ান্তানামো কারাগারে তিন ভাই শহীদ হয়েছেন : মানি আল উতাইবি (৩০), ইয়াসির আল জাহরানী (২০) এবং আলী আবদুল্লাহ আহমেদ (৩৭)। এই তিন তরুণের মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল। আমেরিকা প্রচার করল এঁরা আত্মহত্যা করেছেন, কিন্তু আমি তো জানি এবং আপনারাও নিশ্চই বুঝতে পারছেন এটা তাদের সাজানো মিথ্যে ছিল। বন্দীদের ওপর এমন দুর্ভাগ্য তো আর এবারই প্রথম নেমে আসেনি।

সৌদি সরকার তাই আমেরিকাকে এ ঘটনা নিয়ে প্রশ্নবিদ্ধ করল। ভাই উতাইবি ভাই এবং ইয়াসির ভাই দুজনই ছিলেন সৌদি নাগরিক। আর আলী আবদুল্লাহ ভাই ছিলেন ইয়েমেনীয়। ইয়েমেন সরকার তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন নিয়ে কাজ করছিল। তিনিও এটি জানতেন এবং দেশে ফেরার জন্য এক বুক আশা নিয়ে দিন পার করছিলেন।

স্বাধীন সাংবাদিকদের এক অনুসন্ধানের মাধ্যমে বেরিয়ে আসে যে, এই বন্দীদের দুইদিন আগে অর্থাৎ ৯ই জুন তাঁদের সেল থেকে বের করে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। জায়গাটাকে তারা বলে 'ব্ল্যাক সাইট'। এরপর তাঁদেরকে তাঁদের কারাকক্ষে না এনে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। প্রতিবেদনে বলা হয়, তাঁদের খুব মারাত্মকভাবে মারা হয়েছিল। এবং মার্কিনীরা এর নাম দিয়েছে, 'উন্নততর জিজ্ঞাসাবাদ কৌশল'। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি, সেই ভাইদেরকে অত্যাচার করতে করতে ওখানেই মেরে ফেলা হয়েছে।

আল্লাহ আমার ভাইদেরকে জান্নাতে দাখিল করুন আর ধ্বংস করে দিন অত্যাচারীদের, যাদের এই দুনিয়ায় বিচারের মুখোমুখি হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই।

পরবর্তীতে জানতে পারি ব্রিটেনের বন্দী শাকের আমেরকেও সেদিন, অর্থাৎ ৯ই জুন, ব্ল্যাক সাইটে নেওয়া হয়েছিল। তাঁকেও মারতে মারতে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল। আমের জানান, জিজ্ঞাসাবাদের নামে একটি চেয়ারের সাথে তাঁর পুরো শরীর বেল্ট দিয়ে বেঁধে ফেলা হয়। তারপর তীব্র চাপ প্রয়োগ করা হয়েছিল তাঁর সারা গায়ে। তারা তাঁর চোখেও মেরেছিল। আঙুল বাঁকিয়ে, মুচড়ে ধরে রেখেছিল যতক্ষণ না তিনি যন্ত্রণায় চিৎকার করে ওঠেন। আর চিৎকার করার সাথে সাথেই তাঁর গলা চেপে ধরা হয়। মুখের চারপাশ ঘিরে দেওয়া হয় একটি কাপড় দিয়ে–যেন তিনি চিৎকারও করতে না পারেন। আমের বলেছেন যে, তিনি শ্বাস প্রায় নিতেই পারছিলেন না।

যদিও আমের মুক্তির ছাড়পত্র পেয়ে গিয়েছেন অনেক আগেই, তবুও তিনি এখনও গুয়ান্তানামোতে আটক আছেন। সেই জাহান্নামসম জায়গায় যেখানে আমাদের তিন নিরপরাধ ভাইসহ আরও অনেককেই অত্যাচার করতে করতে মেরেই ফেলা হয়েছে।

নির্দোষ ব্যক্তিদের ওপর নির্যাতন চালানোর কথা আমেরিকানরা সম্পূর্ণ অস্বীকার করছে দেখে আমি মোটেও বিস্মিত হইনি। বন্দী ব্যক্তিরা যে আত্মহত্যা করেননি বরং তাঁদের হত্যা করা হয়েছে, একথা উল্লেখ করে দাখিলকৃত প্রতিবেদনের সমস্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তারা বিকৃত করেছে এবং এখনও তাদের সৈন্য ও জেনারেলরা সমস্ত আন্তর্জাতিক আইনকে তোয়াক্কা না করে নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এই লোকগুলোই সত্যিকারের সন্ত্রাসী। আমি নিজেই তাদের হাতে অবর্ণনীয় যন্ত্রণা সয়েছি। আমার মতোই আরও অনেক মুসলিম সেখানে চোখ বাঁধা অবস্থায় ছিলেন, আছেন। শেকল দিয়ে বেঁধে, প্রহার করে, লাথি মেরে আমাদেরকে অত্যাচার করা হয়েছে, হচ্ছে। শাস্তি দেওয়ার জন্য ঘুমুতে দেওয়া হয় না, খাবার দেওয়া হয় না ঠিকমতো। দমবন্ধ করা কক্ষে মাসের পর মাস আটকে রেখে আমাদেরকে বঞ্চিত করা হয়েছে যেকোনো মানুষের সংস্পর্শে

আসা থেকে। আমাদের অপমানিত, অপদস্থ করা হয়েছে। আমাদের সংস্কৃতি এবং ধর্মকে করা হয়েছে কটাক্ষ।

কোনো অন্যায়ের প্রমাণ ছাড়াই আমাদের সাথে অমানুষের মতো আচরণ করা হয়েছে। পশুও থাকতে পারবে না এমন খাঁচায় এখনও বন্দী করা হয় মুসলিমদের। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা এবং এভাবেই চিরতরে বন্দী থাকার আতঙ্ক মানুষগুলোকে করে দেয় হতাশ, হতোদ্যম। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে বন্দীরা বাস্তবতাকে আর ধরতে পারেন না, যে বাস্তবতা নিজেই অসহ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে ইতোমধ্যে।

আমেরিকার কারাগারে মানবিক আচরণ করার কোনো নিয়ম নেই। তাদের অত্যাচারের নেই কোনো সীমারেখা। কোনো বন্দীকেই তাঁর আইনগত অধিকার সম্পর্কিত কোনো তথ্য দেওয়া হয় না, কোনো আইনজীবী সম্পর্কে বা বন্দীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও কিছু জানানো হয় না। বছরের পর বছর বন্দীকে কোনো বইও দেওয়া হয় না অন্তত যেটা পড়ে অনেক কিছু ভুলে থাকা যায়। অন্য সাধারণ বন্দী যেমন পড়াশোনার সুযোগ পেয়ে থাকে, এখানে তাও নেই। অনির্দিষ্ট কালের জন্য জোটে নির্জন কারাবাস। শাস্তি দেওয়ার জন্য চোখের সামনে জ্বালিয়ে রাখা হয় অন্ধ করে দেওয়ার মতো উজ্জ্বল আলো, কানের কাছে বাজানো হয় মাথা খারাপ করা তীব্র শব্দের মিউজিক। অসহ্য গরম বা হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডায় নগ্ন করে দাঁড় করিয়ে রাখা তো ওদের নিত্যদিনের ঘটনা।

অসুস্থ হয়ে কেউ মারা গেলেও এতটুকু দয়া তাদের মনে জন্মায় না। আর তার সাথে চলে সাইকোলজিক্যাল গেইম: হুঁটহাট এসে একটা তীব্র দুঃসংবাদ দিয়ে যায় ওরা। এবং অবধারিতভাবেই সেগুলো সব মিথ্যা। বলে, তোমার বাবাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কিংবা তোমার ভাই/বোন/মা মারা গেছে। এমনিতেই এত দূরে বন্দী মানুষেরা তাঁদের পরিজন নিয়ে চিন্তিত থাকেন। তার ওপর এসব দুঃসংবাদ শুনে কষ্টের মাত্রা ছাড়িয়ে যায় যে কোনো মাত্রা। এছাড়া কোনো চিঠি এলে সেটাকেও তারা এমনভাবে কাটাকুটি করে, যে প্রকৃত লেখার আর উল্লেখযোগ্য কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' রাশভারী এমন নাম দিয়ে নিরীহ মানুষগুলোর ওপরে শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতন চালানো হয় এসব কারাগারে। বুশ,

এমনকি ওবামাও সম্প্রতি কারাগারগুলোতে বাড়াবাড়ির কথা স্বীকার করেছে। তবু এত এত আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কেউই এসব আইনের উর্ধ্বে থাকা বন্দীশালা বা খুনি লোকদের বিরুদ্ধে যেন কিছুই করতে পারছে না।

গুয়ান্তানামো বে কারাগার সমগ্র বিশ্বের জন্যই একটি বিষফোঁড়া। বিশ্ব নেতাদের অদ্ভুত নীরবতা এবং সচেতন মানুষদের অসম্ভব নির্লিপ্ততা একে এখনও সচল রেখেছে। আজ এত মানুষ কেন আমেরিকাকে ঘৃণা করে–এর উত্তর খুঁজতে চাইলে কেবল গুয়ান্তানামো বে কারাগারসহ পৃথিবীজুড়ে আমেরিকার কারাগার এবং ব্ল্যাক সাইটগুলোর নেটওয়ার্কের দিকে তাকালেই হবে। যদি পৃথিবীতে শান্তি আনতে চান, তাহলে এই কারাগারগুলো বন্ধ করতে হবে। নিরপরাধ মানুষগুলোকে তাঁদের পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে। আর যারা এই মানুষগুলোর এমন পরিণতির জন্য দায়ী তাদের বিচারের আওতায় আনতে হবে। এভাবেই আসলে এই বিষফোঁড়ার ক্ষত সারানোর কাজ শুরু করা সম্ভব।

কারাবন্দিদের নিয়ে প্রজন্ম পাবলিকেশনের আরো কিছু বই

১। আফিয়া সিদ্দিকী | গ্রে লেডি অব বাগরাম

সংকলন: টিম প্রজন্ম

২। কয়েদী ৩৪৫ | গুয়ান্তানামোতে ছয় বছর

সামী আলহায

৩। এনিমি কমব্যাটান্ট

মোয়াজ্জেম বেগ

৪। আফিয়া সিদ্দিকী | এফবিআই'স মোস্ট ওয়ান্টেড উইম্যান

দাউদ গজনবী

প্রজন্ম পাবলিকেশনের সকল বই সম্পর্কে জানতে

www.projonmo.pub
facebook.com/projonmopublication

কয়েদী ৩৪৫
গুয়ান্তানামোতে ছয় বছর
সামি আলহায

এনিমি কমব্যাট্যান্ট
গুয়ান্তানামো কারাগারে আমেরিকা কর্তৃক
মুসলিম নির্যাতনের ভয়ঙ্কর সত্য ঘটনা
মোয়াজ্জাম বেগ
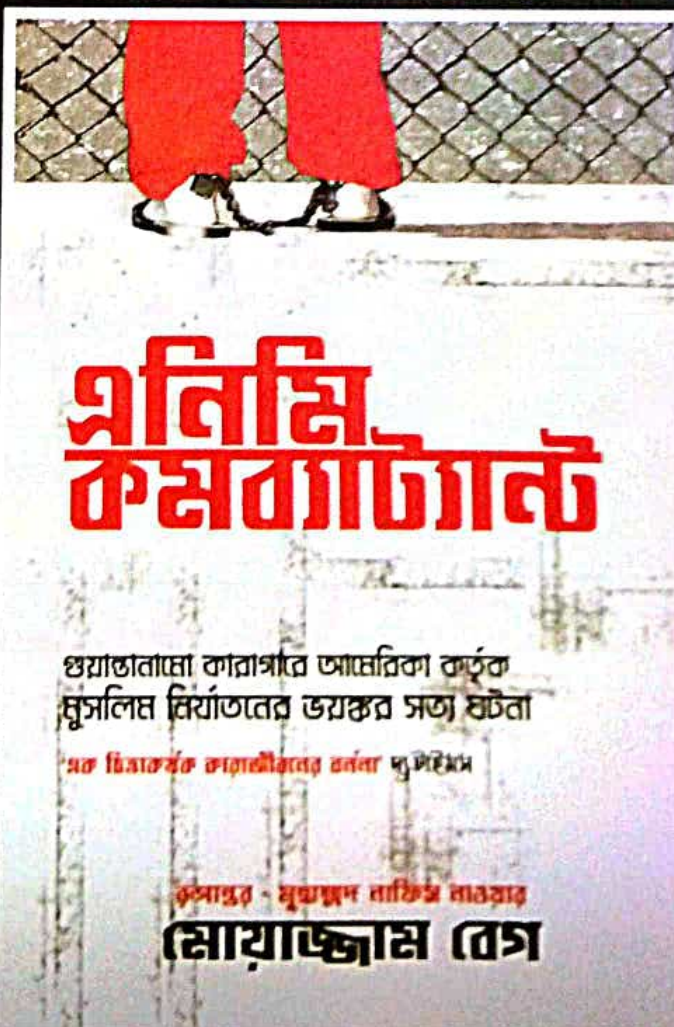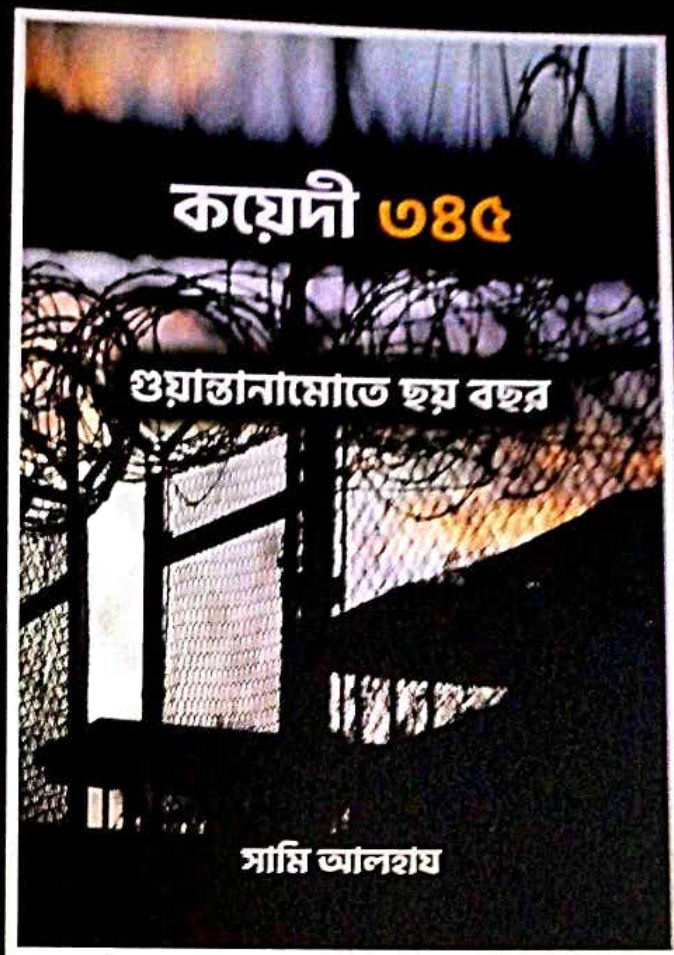
আমেরিকা। নাম শুনলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে উন্নতির শিখরে থাকা একটি দেশ। চকচকে রাস্তাঘাট, ঝকঝকে উঁচু দালান। অর্থ আর প্রাচুর্যের মোহ হাতছানি দিয়ে ডাকে সেই দেশটির দিকে। কিন্তু একটু ভালোভাবে চিন্তা করলেই মনে পড়ে দেশটির সরকার বর্তমান বিশ্বের চলমান এবং সাম্প্রতিক সময়ে ঘটে যাওয়া প্রায় সমস্ত যুদ্ধের জন্যই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দায়ী।

সৈন্য পাঠিয়ে, ড্রোন হামলা চালিয়ে আমেরিকা নিয়মিত অসংখ্য মানুষের মৃত্যুর কারণ হচ্ছে একেবারে আমাদের চোখের সামনেই। কিন্তু গোপনে তারা গুয়ান্তানামো, আবু গারিবসহ অসংখ্য ভয়ঙ্কর কারাগার স্থাপন করে ইতিহাসের পাতায় লিখে যাচ্ছে সীমাহীন অত্যাচার আর নিপীড়নের ভয়াবহ একেকটি অধ্যায়। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত সংগঠন জাতিসংঘ তাদের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারছে না।

এই বইটিতে গুয়ান্তানামো বে কারাগারে অন্তরীণ হওয়া পাকিস্তানে নিযুক্ত সাবেক আফগান রাষ্ট্রদূত আব্দুস সালাম জাইফের সাবলীল বর্ণনায় উঠে এসেছে সেখানকার নিদারুণ কষ্টকর একেকটি দিনের স্পষ্ট চিত্র। আছে নিরপরাধ মানুষগুলোকে অপরাধী প্রমাণের জন্য সেখানকার কর্মকর্তাদের একের পর এক ব্যর্থ চেষ্টার বিবরণ। কেবল একজন সাধারণ বন্দীই না, একজন রাজনীতিবিদের চোখে অন্ধকার সে কারাগারের প্রকৃত পরিস্থিতিটা আসলে কেমন তা সম্পর্কে ধারণা পেতে এই বইটি যথেষ্ট সাহায্য করবে। রাজনৈতিক কূটকৌশল কেমন করে রাজনীতির ভাষা দিয়েই সামলাতে হয় তারও দেখা পাওয়া যাবে এই বইটিতে।

প্রজন্ম

BDT ৳ 235
USD $ 14

www.projonmo.pub

NON FICTION
ISBN: 978-984-94393-5-6